PhotoScan by SenSoft
হলদে
বাড়ির রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

হলদে বাড়ির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কালই যাচ্ছি তো?"

স্বপন একটু আমতা আমতা করে বলল, "কালই? কেন আর দু-একদিন দেরি করলে হয় না?"

বিমান বলল, "আর দেরি করে কী হবে? কাল তো আমাদের কিছুই করবার নেই!"

স্বপন বলল, "সাত তারিখে প্রিয়ব্রতদা এসে যাবেন। তার মানে আর তিনদিন বাদে!"

"প্রিয়দা এলে কী হবে? প্রিয়দা দারুণ কুঁড়ে, তুই জানিস না! কোথাও যেতে চাইবে না, আমাদেরও যেতে দেবে না!"

"প্রিয়দা কুঁড়ে? পুলিশের লোক কখনো কুঁড়ে হয়?"

বিমান হাসল। যেন স্বপনটা একটা বাচ্চা ছেলে, কিছুই জানে না।

হাসতে হাসতে বিমান বলল, "তুই তো প্রিয়দাকে আমার চেয়ে বেশী চিনিস না! কোনো রহস্য কিংবা খুন-টুন থাকলে প্রিয়দা খুব ছোটাছুটি করে বটে, কিন্তু অন্য সময় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বেড়াতে ভালবাসে না, কোনো নতুন জায়গায় যেতে চায় না। চল, আমরা কালই বেরিয়ে পড়ি।"

স্বপন বলল, "বড্ড দূর! একদিনে কি পৌঁছোতে পারব?"

বিমান বলল, "কত আর দূর হবে? জায়গাটা এখান থেকে চোখে দেখা যায়—"

"তুই জানিস না, বিমান, পাহাড়ী জায়গায় খালি চোখে দূরত্ব বোঝা যায় না। যে-পাহাড়কে মনে হয় খুব কাছে, আসলে সেটা অনেক দূরে। পাড়সান, সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—"

"সঞ্জীবচন্দ্র একথা লেখার ফলে কী হয়েছে জানিস তো? যে-পাহাড়টা আসলে খুব কাছে, সেটাও বাঙালীরা মনে করে খুব দূরে! এই তো লাট্টু পাহাড়টা আমি এখান থেকে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি, তা বলে কি এটা অনেক দূরে? মাত্র দেড় মাইল তো—"

"দেড় মাইল না, অন্তত আড়াই মাইল!"

"তুই মেপেছিস?"

"তুই মেপেছিস?"

"আমি মাপিনি, কিন্তু আমার আন্দাজ আছে।"

"আমারও আন্দাজ আছে।"

"তবে আয় মেপে দেখি, কারটা ঠিক!"

"এই রোদ্দুরে বেরিয়ে পাহাড় মাপতে আমার বয়ে গেছে! আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি!"

"কাল আমরা রোদ্দুর ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়ব। খুব ভোরে।"

"ঐ জায়গাটা কত দূরে হবে বলে তোর আন্দাজ?"

"লাট্টু পাহাড়ের ওপর থেকে জায়গাটা দেখা যায়। আমার তো মনে হয়, সাত-আট মাইলের বেশী হবে না। বড় জোর দু-তিন ঘণ্টা লাগবে। ভোরবেলা বেরুলে, সব দেখে-শুনে আমরা বিকেলের আগেই ফিরে আসতে পারব।"

"এই পাহাড়ী রাস্তা আর মাঠের মধ্য দিয়ে সাত-আট মাইল হাঁটা—কোনো মানে হয়? তোর যত অদ্ভুত শখ! কেন, ওখানে যেতে হবে কেন?"

"বাঃ, জায়গাটা রয়েছে কেন? রয়েছে বলেই যেতে হবে!"

স্বপন হঠাৎ বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "নাঃ, আমি যাব না ভাবছি!"

"কেন?"

"এমনিই। ভাল লাগছে না!"

বিমানও একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে অবশ্য যেতে হবে। আমি যেটা একবার ঠিক করি, সেটা সহজে ছাড়ি না। তুই যেতে না চাস, আমি একাই যাব। তুই তাহলে যাবিই না?"

"এখনো পুরোপুরি ঠিক করিনি। যদি কাল সকালে মুড ভাল থাকে, তা হলে যাব। না হলে যাব না!"

"ফেয়ার এনাফ্। আমি অবশ্য কাল যাচ্ছিই।"

এই সময় কেষ্ট এসে জিজ্ঞেস করল, "দাদাবাবু, আপনাদের চা দেব?"

স্বপন বলল, "এখানে না। বাগানে দাও! চায়ের সঙ্গে আর কী আছে?"

কেষ্ট বলল, "বিস্কুট!"

স্বপন বিরক্ত হয়ে বলল, "ধুৎ, বিস্কুট! প্রত্যেকদিনই কি

বিস্কুট খাব? কেন, পেঁয়াজি কি ফুলকপি ভাজা আর মুড়ি-টুড়ি দিতে পারো না?"

কেষ্ট বলল, "নুচি তরকারি করে দেব?"

"নুচি নয় কেষ্ট, লুচি। যতদিন না তুমি লুচি বলতে পারবে ততদিন আমি তোমার হাতে লুচি খাব না। আমার ঠাকুর্দা নুচি বলতেন বলে তুমিও নুচি বলবে? আমার বাবা বলেন না, আমি বলি না—দ্যাখো, এই দাদাবাবু তোমার কথা শুনে হাসছেন—"

বিমান সত্যিই তখন মিটিমিটি হাসছিল। স্বপন তার দিকে তাকাতেই বিমান বলল, "আমার বাবা কিন্তু এখনো নুচি বলেন, শুধু তাই নয়, বলেন নেবু, নংকা—আমার তো শুনতে বেশ ভালই লাগে—"

স্বপন তখন কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে কেষ্ট, তুমি এই দাদাবাবুকে যত খুশী নুচি—নেবু—নংকা খাওয়াও, আমাকে দেবে মুড়ি, পেঁয়াজ, নারকোল!"

বাড়ির সামনে অনেকখানি চওড়া বাগান। অনেক গোলাপ আর জুঁই ফুল ফুটে আছে। বাগানের মাঝে-মাঝে সাদা রঙের বেঞ্চ পাতা। সেখানে বসলে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়, আর ছোট ছোট পাহাড়।

বিমান আর স্বপন মাত্র দু-দিন আগে এখানে বেড়াতে এসেছে। এই বাড়িটা স্বপনদের। আর কয়েক দিনের মধ্যে স্বপনের মা-বাবা ও আরও অনেকে এখানে চলে আসবেন কলকাতা থেকে। ওরা দুজন শুধু একটু আগে আগে এসেছে। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর।

কাছেই লাট্টু পাহাড়। ওরা সকালে বিকেলে সেই পাহাড়ের ওপর বেড়াতে যায়। সেই পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে আর-একটা ছোট পাহাড়ের ওপর একটা হলদে রঙের বাড়ি দেখা যায়। সেদিকটায় আর কোনো বাড়ি ঘর কিছু নেই। শুধু মাঠ আর পাহাড়—তার মধ্যে ঐ রকম একটা একলা-একলা বাড়ি কেন? বিমান ভেবেছিল, ওটা একটা দুর্গ। কিন্তু দুর্গের রং তো ওরকম হলদে হয় না! কেউ কেউ বলে, ওটা কোনো এক জমিদারের বাড়ি ছিল। এক সময় এক জমিদার শখ করে বানিয়েছিলেন নিরালায় থাকার জন্য, এখন আর সেই জমিদার-বংশের কেউ নেই। বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে।

বিমান তাই চায় বাড়িটার মধ্যে ঢুকে দেখে আসতে।

ওরা দুজন বাগানে বেরিয়ে এসে একটা বেঞ্চে বসতে গেল। স্বপন একটা হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মাটি মানে তো পাথর, এখানে একটু পড়ে গেলেই খুব জোর লাগে। স্বপনের কপালটা একটু কেটে গেছে।

বিমান বলল, "উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না! চশমা আনতে ভুলে গেছিস তো?"

স্বপন বলল, "দ্যাখ তো, চশমাটা বোধহয় টেবিলের ওপর ফেলে এলাম!"

বিমান দৌড়ে বাড়ির ভেতর গিয়ে চশমাটা নিয়ে এল। সেটা স্বপনের হাতে দিয়ে বলল, "চশমা ছাড়া একটুখানি গেলেই তো তুই গুঁতো খাস কিংবা আছাড় খাস্। তবু সব সময় চশমা পরে থাকার কথা তোর মনে থাকে না?"

স্বপন বেঞ্চে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে কপালের রক্ত মুছল।

বিমান বলল, "ওষুধ লাগাবি না?"

"কোনো দরকার নেই। ঐ দিকে দেখ একটা গাঁদা ফুলের গাছ আছে। তার থেকে কটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আয়।"

বিমান গাঁদা ফুলের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে কচলে লাগিয়ে দিল কাটা জায়গাটায়। স্বপন কপালটা চেপে ধরে থেকে বলল, "এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমার ওরকম কত কাটে!"

বিমান বলল, "তুই তো রাত্তিরে ঘুমোবার সময় চশমা খুলে রাখিস! তাহলে স্বপ্ন দেখিস কী করে?"

স্বপন হেসে বলল, "ঘুমের মধ্যে যেই এক-একটা স্বপ্ন এসে ঝিলিক মারে, অমনি আমি হাত বাড়িয়ে চশমাটা পরে নিই!"

"তোর অনেক কম বয়েস থেকেই চোখ খারাপ, নারে?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই তো খুব সুবিধে হয়েছে।"

"সুবিধে?"

"সুবিধে নয়? চোখে ভাল দেখতে পাই না বলেই তো মনে মনে অনেক কিছু দেখতে পাই! তোদের সব কিছু দেখতে হয় হেঁটে-হেঁটে ঘুরে-ঘুরে—আর আমি এক জায়গায় বসে থেকে মনে-মনেই অনেক কিছু দেখে নিই।"

'মনে-মনে আর কতটা দেখা যায়? যে-জায়গায় তুই কখনো যাসনি, সে-জায়গা দেখতে পাবি?"

"তাও পাই। আমার চোখের জোর কম বলেই মনের জোর বেশী। যেমন ধর না, ঐ যে পাহাড়ের ওপর হলদে বাড়িটা—আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি ওর মধ্যে কী আছে!"

"যা যা, আর বাজে গুল ঝাড়তে হবে না!"

"আমি বলে যাচ্ছি, তুই মিলিয়ে নিস কাল। বাড়িটার সামনে—"

এই সময় কেষ্ট খাবার নিয়ে এল। সত্যি সে দু প্লেটে দুরকম খাবার নিয়ে এসেছে। এক প্লেটে লুচি বেগুনভাজা, আর এক প্লেটে মুড়ি নারকোল।

সেই খাবার দেখে দুজনে হেসে উঠল।

বিমান বলল, "দ্যাখ, আমি তোর চেয়ে ভাল খাবার পেয়ে গেলাম। তুই কেন কেষ্টকে বকতে গেলি!"

স্বপন বলল, "আমি মুড়ি নারকোলই বেশী পছন্দ করি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বিমান বলল, "কী রে স্বপন, তুই চোখ বুজে আছিস কেন? খাচ্ছিস না?"

স্বপন বলল, "বাড়িটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের গা থেকেই থাক-থাক সিঁড়ি ভাঙা। বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে। ওপরে উঠেই একটা বেশ চওড়া উঠোন। সেই উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডি-ফ্লোরা গাছ। তুই এ গাছ দেখেছিস?"

বিমান বলল, "ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। দেখিনি কখনো।"

"এই রকম বড় সাদা রঙের ফুল হয়, ঠিক হাঁসের ডিমের মতন সাইজ। জমিদারটি খুব শৌখিন ছিলেন। তারপর উঠোন পেরিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে গেলে......না, তুই ঢুকতে তো পারবি না! সদর দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝোলানো। সেই তালাতে মরচে ধরে গেছে, তবু ভেঙে ফেলা সহজ নয়।"

"তুই এত সব দেখতে পাচ্ছিস?"

"একেবারে স্পষ্ট। ঠিক সিনেমার ছবির মতন। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ঢুকতে পারবি ভেতরে—একটা উপায় আছে, বাড়িটার ডানদিকে একটু গেলেই দেখবি একটা ঘরের জানলা একদম ভাঙা—তার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়া যায়। সেই ঘরে ঢুকেই দেখবি, ছাদের কাছে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ—"

"তার মানে ভূত?"

"অত সহজে ভূত দেখা যায় না। ঐ চোখ দুটো হুতোম প্যাঁচার। ঐ বাড়িতে হুতোম প্যাঁচার বাসা আছে। সেটা এক-

পক্ষে খুব ভাল, তার মানে সাপ-টাপ নেই। প্যাঁচা থাকলে সাপ থাকে না সেখানে। ইঁদুরও থাকে না।"

"ঠিক আছে, আর শুনতে চাই না!"

স্বপন তখনো চোখ বুজে আছে। বিমানের দিকে হাত তুলে বললে, "শোন না, আর একটা খুব মজার জিনিস দেখছি —সারা বাড়িতে অনেক তুলো ছড়ানো—মনে হয় যেন অনেকগুলো তাকিয়া আর বালিশ কেউ ফালা-ফালা করে ছিঁড়েছে—সেই তুলো ছড়িয়ে গেছে বাড়িময়—আর দোতলার সিঁড়িতে ভাঙা আয়নার কাচ—দোতলায় অনেকগুলো ঘর, একটা, দুটো ......সবশুদ্ধ আটটা। সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালেই কিন্তু দড়াম করে একটা শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু বাড়িটাতে কোনো লোক নেই। জন্তু-জানোয়ারও নেই।"

স্বপন এবার চোখ খুলে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "শব্দটা তাহলে কিসের?"

"তুই ভূত ভাবছিস তো?"

"আমি কিছুই ভাবিনি। তুই-ই তো বানিয়ে বানিয়ে এতক্ষণ এত সব বলে গেলি।"

"এক বর্ণও বানাইনি। আমি দূরের জিনিস মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাই। ছাদের দরজাটা খোলা, হাওয়ায় সেই দরজাটায় দড়াম-দড়াম করে আওয়াজ হয়। এই তো আছে বাড়িটার মধ্যে, আমি এখানে বসেই বলে দিলাম, তাহলে আর শুধু শুধু অতদূর যাবি কেন?"

"তুই কতটা গুল ঝাড়লি, সেটা মিলিয়ে দেখার জন্যও তো যাওয়া দরকার।"

"ঠিক আছে, গিয়ে দেখিস, আমার প্রত্যেকটা কথা মিলে যাবে, তোর ভূত দেখার শখ তো! অত সহজে তাদের দেখা যায় না! ভূতরা এখন আর এই পৃথিবীতে থাকে না।"

বিমান মনে মনে ভাবল, গত বছরই সে জলপাইগুড়িতে বুধ সিংয়ের ভূতকে দেখেছে। কিন্তু সে-কথা স্বপন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। তাই সে চুপ করে রইল।

স্বপন বলল, "দাঁড়া, আরও খবর তোকে জোগাড় করে দিচ্ছি।"

গলা চড়িয়ে সে ডাকল, "কেষ্ট, কেষ্ট!"

কেষ্ট এসে দাঁড়াতেই স্বপন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কেষ্ট, দূরে পাহাড়ের ওপর যে হলদে বাড়িটা দেখা যায়, সেটাতে ভূত আছে?"

কেষ্ট বলল, "কোনটা? পুতুলহাটের রাজার বাড়ি?"

"ওটা আবার রাজার বাড়ি নাকি?"

বিমান বলল, "তার মানে কোনো জমিদারের বাড়ি। আগেকার অনেক জমিদারকেই রাজা বলা হতো। এই শিমুলতলায় সেরকম জমিদারদের অনেক বাড়ি আছে।"

স্বপন বলল, "ঐ বাড়িতে ভূত নেই কেষ্ট?"

কেষ্ট ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "না তো, শুনিনি তো দাদাবাবু?"

"শোনোনি? ঐ বাড়িতে কেউ যায়?"

"অতদূরে কে যাবে? রাস্তাও তো নেই!"

"রাস্তা নেই? তাহলে জমিদারবাবুরা যেতেন কী করে?"

"ওনারা তো যেতেন হাতির পিঠে কিংবা পাল্কিতে। গাড়িটাড়ি যেতে পারে না।"

"এখানে তো আরও অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে। আর কোনো বাড়িতে ভূত নেই?"

কেষ্ট একগাল হেসে বলল, "না দাদাবাবু, এদিকে ভূত কোথায়?"

স্বপন বলল, "দেখলি, দেখলি বিমান! আজকাল গ্রামের লোকেরাও ভূত মানে না! তাহলে তুই আর কী দেখতে অত দূরে যাবি?"

"এমনিই। ঠিক করেছি যখন যাব।"

"তোকে ঐ বাড়িটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে মনে হচ্ছে।"

বিমান বলল, "বোধহয় তাই!"

২

পরদিন খুব ভোরে বিমান চোখ মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল। স্বপন তখনও ঘুমোচ্ছে, তাকে বিমান ডাকল না। স্বপনের যখন যাবার ইচ্ছে নেই, তখন তাকে বিমান শুধুশুধু জোর করবে কেন?

সাদা প্যান্ট শার্ট আর বুটজুতো পরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল একটা ব্যাগ। তার মধ্যে এক প্যাকেট বিস্কুট, চারটে কমলালেবু আর এক বোতল জল। বিমানের কোমরে মোটা বেল্ট আর ডান পায়ের মোজার নীচে লুকোনো আছে একটা ব্লেড। প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে বিমান শিখেছে যে, হঠাৎ বিপদে পড়লে এই দুটো জিনিস অনেক কাজে লাগে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, কেষ্ট এর মধ্যেই উঠে-পড়ে বাগানের গাছে জল দিচ্ছে। বিমানকে দেখে সে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন এত সকালে?"

বিমান বলল, "একটু ঘুরে আসছি।"

"চা খাবেন না?"

"না। শোনো কেষ্ট, আজ দুপুরেও কিছু খাব না। বিকেলবেলা আমার জন্য জলখাবার তৈরি রেখো।"

"দুপুরে খাবেন না? আজ যে মুর্গী কাটব ভেবেছিলাম—"

"স্বপন দাদাবাবু তো থাকছেন। তাঁকে দিও।"

কেষ্টর পছন্দ হল না ব্যাপারটা। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিমান ততক্ষণে বাগানের গেটের কাছে চলে গেছে।

এখনো সূর্য ওঠেনি, কিন্তু সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে নতুন আলো। ঠান্ডা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। ঘাসগুলো শিশিরে ভেজা। হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে বিমানের।

স্বপনটা এল না? সঙ্গে আর একজন কেউ থাকলে বেশ ভাল হত। স্বপন স্কুল থেকে বিমানের সঙ্গে পড়ে, এখনো কলেজে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে ওরা দুজন। স্বপনের বেশ বুদ্ধি আছে, কিন্তু একদম হাঁটতে ভালবাসে না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসে ঘুমোতে। ঘুমোকু পড়ে-পড়ে।

একটুখানি হেঁটে আসার পর বিমান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিল। সেই হলদে বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। সেই পাহাড়টাও দেখা যায় না। লাট্টু পাহাড়ের ওপরে চড়লে তখন চোখে পড়ে। তা বলে এখন আর লাট্টু পাহাড়ের ওপরে চড়বার দরকার নেই, পাহাড়ের ডান দিক দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে কয়েক মাইল পর নিশ্চয়ই সেই বাড়িটা দেখা যাবে।

আর একটুখানি এগোতেই বিমান পেছনে একটা চ্যাঁচামেচি শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, স্বপন ছুটতে ছুটতে আসছে আর তার নাম ধরে ডাকছে।

কাছে এসে স্বপন বলল, "তুই আচ্ছা ইডিয়ট তো! আমাকে কিছু না বলে চলে এসেছিস?"

বিমান বলল, "বাঃ, কাল সন্ধেবেলাই তো সব বলা হয়ে গেছে। তাই তোকে আর ডাকলাম না।"

"উঃ, এত ভোরবেলা কোনো মানুষ ওঠে? চা-টা খাওয়া হয়নি, কিছু না! চল চল চল, আগে চা-টা খেয়ে নিই।"

"আমি আর যাব না রে, স্বপন। তুই গিয়ে চা খেয়ে নে-না!"

স্বপন মুখ ভেঙচে বলল, "আমি একলা-একলা চা খাবো? তাহলে এতদূরে ছুটতে ছুটতে এলাম কেন?"

বিমান হেসে বলল, "তাই তো, এলি কেন?"

"আমি না-এলে তোর খুব মজা হত, তাই না? যত ইচ্ছে গুল চালাতে পারতি?"

"তার মানে?"

"তুই এই মাঠ-ফাটের মধ্যে খানিকটা ঘুরে-টুরে এসে আমাকে বলতি যে, হলদে বাড়িটা দেখে এসেছিস।"

"কিন্তু আমি তো বাড়িটা দেখতেই বেরিয়েছি। তোর কাছে গল্প করবার জন্য তো –"

"না হয় ধরেই নিলাম তুই হলদে বাড়িটা পর্যন্ত গেলি। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলি না। এমনি সাধারণ একটা খালি বাড়ি! আমার কাছে এসে কি তা স্বীকার করতি? বানিয়ে-বানিয়ে বলতিস যে ভূত আছে, পেত্নী আছে, সাপ আছে— আমি যা যা বলেছি তা কিছুই মেলেনি। সেইজন্য আমি নিজে তোর সঙ্গে গিয়ে চেক করে দেখতে চাই!"

"বেশ তো, চল না!"

স্বপন তবু গজ-গজ করতে লাগল। "মুখ ধোওয়া হল না, দাঁত মাজা হল না, কিছু খাওয়া হল না, এই রকম ভাবে কেউ বেরোয়! কেন বাবা, ভাল করে খেয়ে-টেয়ে নিয়ে একটু পরে বেরুলে কী হত?"

"বেশী রোদ্দুর উঠে গেলে হাঁটতে কষ্ট হবে!"

"খালি পেটে আরও বেশী কষ্ট হয়!"

"আমার সঙ্গে বিস্কুট আর কমলালেবু আছে, তাই খেয়ে নে!"

"মুখ না-ধুয়ে আমি খাবার খাব? আমি কি জংলী নাকি? তুই নিমগাছ চিনিস? একটা নিমগাছ দেখলে তার একটা ডাল ভেঙে দে তো!"

"আমি ভাই নিমগাছ-টিমগাছ চিনি না!"

স্বপন একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই তো একটা নিমগাছ। যা, একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আয়।"

বিমান বলল, "তুই আনতে পারছিস না?"

নিমগাছ কিনা কে জানে, গাছটা বেশ বড়। ডাল ভাঙতে হলে গাছের ওপরে উঠতে হবে।

স্বপন সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এখন মুড ভাল নেই। মুড ভাল না থাকলে আমার গাছে চড়তে ইচ্ছে করে না।"

"আমি তোকে কোনোদিন গাছে চড়তে দেখিনি!"

"দেখবি, একদিন দেখবি! সেরকম একটা পছন্দসই খুব বড় গাছ পাই, তার মগডালে উঠে তোকে দেখাব। এখন একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আয়।"

বিমান জুতো খুলে তরতর করে গাছে উঠে গেল। তারপর একটা বেশ বড় ডাল ভেঙে সেটা ফেলে দিল স্বপনের মাথার ওপরে। স্বপন তাড়াতাড়ি মাথাটা সরাতে যাওয়ায় তার চশমাটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

স্বপন চশমাটা তুলে নিয়ে দেখল ভেঙেছে কিনা। ভাঙেনি, কিন্তু চশমার একটা ডাঁটি একটু আলগা হয়ে গেছে। সে বলল, "চশমাটা ভাঙলে আর আমার যাওয়াই হত না! কী [illegible]ছিলি বল তো?"

বিমান বলল, "তোর এত কষ্ট করে যাওয়ার কী দরকার? তুই এখনো ফিরে যেতে পারিস।"

"তুই একা যেতে চাইছিস কেন? তোর মতলবখানা কী? আমি কিছুতেই ফিরব না!"

স্বপন খানিকটা ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করল। তারপর বিমানের দিকে হাত নেড়ে বলল, "উঁ, উঁ উঁ.."

বিমান বলল, "কী?"

স্বপন মুখ বন্ধ করে ফেলেছে, আর কথা বলবে না। হাতের ভঙ্গি দিয়ে বোঝাল যে তার জল চাই।

বিমানের ব্যাগে এক বোতল খাবার জল আছে। তা মুখ ধোবার জন্য নষ্ট করবে? কিন্তু উপায় কী, স্বপন ছাড়বে না।

পুরো এক বোতল জল দিয়ে স্বপন মুখ চোখ ধুয়ে ফেলল। তারপর সে দুটো কমলালেবু ও পাঁচখানা বিস্কুট খেয়ে ফেলে বলল, "চা ছাড়া কেউ বিস্কুট খেতে পারে? তোর যা বুদ্ধি, বিমান! ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলেই তো হত!"

বিমান বলল, "তুই বুদ্ধি করে সেটা আনলি না কেন?"

"সে-সময়টুকু দিলি কোথায়? ঘুম থেকে উঠেই তো দৌড়োলাম! বললাম, চল ফিরে যাই, আর একটু বাদে বেরুবো—"

"একবার যখন বেরিয়ে পড়েছি, আর ফিরব না কিছুতেই।"

"কিন্তু কমলালেবু আর বিস্কুট এখনই খেয়ে ফেললাম, দুপুরে কী খাব?"

"আরও বিস্কুট আছে!"

"আবার বিস্কুট!"

এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ করে হাঁটল ওরা। এদিকে আর বাড়ি ঘর কিছু নেই। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। হলদে বাড়িটা এখনো দেখা যাচ্ছে না। দূরে-দূরে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়। এদিককার মাটিতে চাষও হয় না। একটু-একটু রোদ উঠেছে। যতদূর দেখা যায়, ঢেউ-খেলানো মাঠের মধ্যে ওরা দুজন মাত্র প্রাণী।

আরও খানিকটা পথ যাবার পর স্বপন বলল, "তোকে বলেছিলাম না, সাত-আট মাইলের অনেক বেশী দূর!"

বিমান বলল, "মোটেই না। আমরা কতটা আর এসেছি, বড় জোর দু'তিন মাইল।"

"দেড় ঘণ্টা ধরে হাঁটছি, তাতে মোটে দু'তিন মাইল হয়?"

"তুই যা আস্তে হাঁটছিস, তাতে আর কত বেশী হবে?"

"কিন্তু সেই বাড়িটা এখনো দেখা যাচ্ছে না কেন?"

সে ব্যাপারে অবশ্য বিমানও একটু চিন্তিত। সত্যিই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। শিমুলতলা থেকে দেখা যায়—অথচ এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেও সেটা আর চোখে পড়ছে না কেন? পথ ভুল হয়ে যায়নি তো? কিন্তু চারপাশ ঘুরে তাকালেও কোনো দিকেই সে-বাড়ির চিহ্ন নেই।
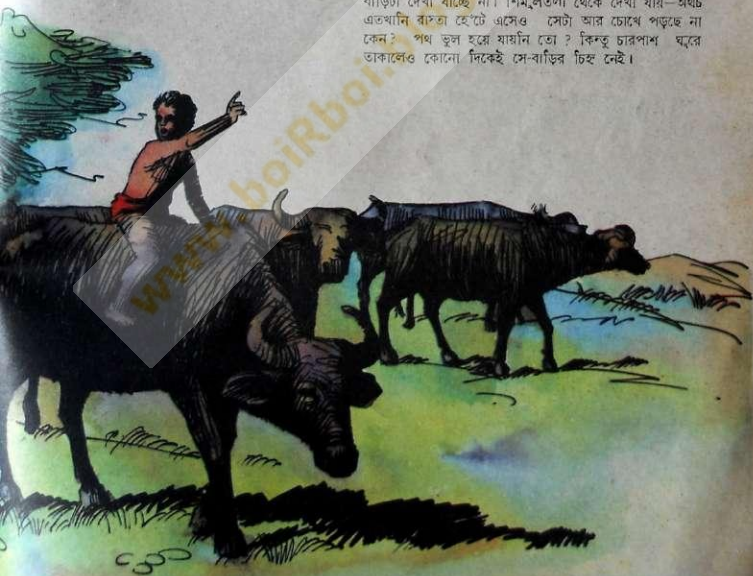
ওরা যেদিকে এগোচ্ছে, তার সামনের দিকে পাশাপাশি দুটো পাহাড়। দুটোরই ওপর দিকটা ন্যাড়া।

তবু বিমান জোর দিয়ে বলল, "এই দুটো পাহাড়ের কোনো একটার ওপরেই আছে সেই বাড়িটা।"

স্বপন বলল, "সেটা কি তবে অদৃশ্য হয়ে আছে? দেখা যাচ্ছে না কেন?"

"হয়তো সেই বাড়িটা এর কোনো একটা পাহাড়ের পেছন দিকে। আমরা উঁচু থেকে দেখছি কিনা, তাই বুঝতে পারিনি।"

"তাহলে একটা পাহাড়ে না-পাওয়া গেলে আর-একটা পাহাড়ে উঠে দেখতে হবে।"

"তা হতে পারে।"

এই দুটো পাহাড়ে উঠতে গেলে বিকেলের আগে কিছুতেই হবে না, এর মধ্যে আমার আবার খিদে পেয়ে যাচ্ছে!"

এমন সময় একটা মোটা গলায় গাঁ আওয়াজ হতেই ওরা চমকে উঠল। ডান পাশে তাকিয়ে দেখল, এক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মোষ, তার পিঠের ওপর ন'দশ বছরের একটা সাঁওতাল ছেলে। তার পেছন দিকে আরও কয়েকটা মোষ ঘাস খাচ্ছে।

স্বপন বেশ খুশী হয়ে উঠল। সেদিকে ফিরে বলল, "মোষের ডাকটা আমার এত মিষ্টি লাগল, ঠিক মনে হল যেন কোকিলের ডাক!"

"কেন?"

"বুঝলি না? মোষ আছে, তার পিঠে একটা ছেলে বসে আছে, তার মানে কাছেই কোনো বাড়িঘর আছে। তার মানে সেখানে খাবার আছে। তার মানে দুপুরটা আর আমাদের না-খেয়ে থাকতে হবে না!"

বিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ভাই, ইধার গাঁও হ্যায়?"

ছেলেটি অবাক হয়ে ওদের দেখছে। কালো তেল-চুকচুকে চেহারা। সে বলল, "হ্যায়।"

"কিধার?"

ছেলেটি নিজের পিঠের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "উধার!"

স্বপন তক্ষুনি সেই দিকে পা বাড়াচ্ছিল, বিমান বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, ওটা তো উল্টো দিক হয়ে যাচ্ছে। আবার অত-দূরে যাব?"

স্বপন বলল, "বাঃ, দুপুরে খেতে হবে না? সাঁওতালদের গ্রামে মুর্গীর মাংসের ঝোল আর ভাত, আঃ, দারুণ!"

বিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ভাই, এখানে পাহাড়ের ওপর একটা বড় বাড়ি আছে না? কোন পাহাড়ের ওপর বলো তো?"

ছেলেটি বলল, "কোঠি? কোঠি তো নেই ইধার!"

বিমান বলল, "নেই? পাহাড়কা উপর!"

ছেলেটি বলল, "পাহাড়কা উপর? ও তো দুখুবাবু কা মোকান!"

"দুখুবাবু? তিনি থাকেন ঐ বাড়িতে?"

ছেলেটি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

"তিনি থাকেন না? তবে কে থাকেন?"

ছেলেটি মুখখানা কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন সে এই বিষয়ে কথা বলতেই চায় না। তারপর বিরক্ত ভাবে বলল, ওখানে এখন 'পরমাত্মারা' থাকে।

স্বপন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে হেসে বলল, "তার মানে কী বুঝলি তো, বিমান? এবার আরম্ভ হল ভূতের গল্প। এরা ভূতকে পরমাত্মা বলে। আগে থাকতেন দুখুবাবু, এখন থাকেন ভূতুবাবুরা! তাই না?"

ছেলেটা আর কিছু উত্তর না দিয়ে 'হেই হ্যাট টু টু রে...' বলে চেঁচিয়ে মোষটার পিঠে খোঁচা মারল। মোষটা চলতে শুরু করে দিল অমনি।

স্বপন বলল, "চল, আমরা ঐ গাঁয়ের দিকে যাই।"

বিমান বলল, "আরে, একটা কথা তো জানা হল না! ছেলেটা চলে যাচ্ছে—"

দৌড়ে গিয়ে সে আবার ছেলেটার কাছে গিয়ে বলল, "এই খোকা, ঐ দুখুবাবুর মোকান কোন্ পাহাড়টার ওপর?"

ছেলেটি একটি পাহাড়ের ওপর আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "বহুৎ দূর হ্যায়!"

"ঠিক হ্যায়!"

স্বপন এর মধ্যেই খানিকটা এগিয়ে গেছে। বিমান তার কাছাকাছি আসতেই স্বপন বলল, "কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা নদী আছে।"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানলি?"

"খুব বেশী দূরে নয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাব।"

"তুই কি আজকাল জ্যোতিষী হয়ে উঠলি নাকি?"

"এর জন্য জ্যোতিষী হওয়ার দরকার হয় না। একটু চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলেই বোঝা যায়।"

সত্যিই আর-একটু এগিয়েই একটা নদী দেখা গেল। খুব বড় নদী নয়, জলও বেশী নেই, শুধু মাঝখান দিয়ে তির তির করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বালির চড়ায় এক ঝাঁক বক বসে ছিল, ওদের দেখে এক সঙ্গে উড়ে গেল। স্বপন দৌড়ে গিয়ে জলে নামল। তার-পর বলল, "এটা হেঁটেই পার হওয়া যাবে। আমার নদী পার হতে খুব ভালো লাগে।"

বিমান সত্যি অবাক হয়ে গেছে। নদীটা দূর থেকে দেখা যায় না, তবু স্বপন এটার কথা জানল কী করে? ও কি আগে দেখেছিল?

শিমুলতলায় এসে বিমান হলদি ঝর্না বলে একটা জায়গার নাম শুনেছে কয়েকবার। সেখানে সবাই পিকনিক করতে যায়। এটাই কি সেই হলদি ঝর্না? সেই কথা বিমান জিজ্ঞেস করল স্বপনকে।

স্বপন বলল, "না, না, হলদি ঝর্না তো পাহাড়ের দিকে। আমি এই নদীটার কথা কী করে জানলাম, তুই সেই কথা এখনো ভাবছিস তো? খুব সোজা। ঐ ছেলেটা যে মোষটার পিঠে বসেছিল, সেই মোষটার পা দুটো লক্ষ করিসনি? মোষটার দু পায়ে অনেকখানি ভিজে কাদা লেগে ছিল। এখানে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি তা হলে কাদা আসবে কোথা থেকে। নিশ্চয়ই মোষটা কোনো নদী পেরিয়ে এসেছে!"

ঠিকই তো বলেছে স্বপন, সে এ-ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। অবশ্য, কাছেই যে একটা নদী আছে, সেটা একটু আগে জেনে কী-ই বা এমন লাভ হয়? স্বপনটা বড্ড বাজে-বাজে ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে।

প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে বিমান জলে নেমে পড়ল। স্বপন মাঝখানে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমান স্বপনের কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

স্বপন বলল, "আমার কী ইচ্ছে করছে জানিস? আমার ইচ্ছে করছে এই নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটতে। নদীটা কোথা

থেকে জন্মেছে, দেখে এলে বেশ ভাল হয়, না?"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, আর একদিন যাব।"

"আর একদিন না, আজই।"

"একটা কাজ করতে বেরিয়ে অন্য কাজ করা আমি পছন্দ করি না। আজ হলদে বাড়িটা দেখতে বেরিয়েছি, সেটাই দেখব!"

"কী হবে একটা ফাঁকা বাড়ি দেখে? তার চেয়ে একটা নদীর জন্মস্থান দেখা অনেক বেশী ইণ্টারেস্টিং!"

"ঠিক আছে, স্বপন, তুই এই নদীর জন্মস্থানটা দেখতে যা। আমি হলদে বাড়িটাতে যাই!"

"ধুৎ! একা-একা কোনো কাজ করতে আমার ভাল লাগে না।

"আমার সঙ্গে যেতে হলে তোকে ঐ হলদে বাড়িতেই যেতে হবে আজ!"

"তুই বড্ড গোঁয়ার, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। আমি যা যা বলেছি, ঐ বাড়িটাতে গিয়ে তো তাই-ই দেখবি! শুধু-শুধু তবু অতটা যেতে হবে!"

"দেখাই যাক্ না!"

নদী পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে এসে ওরা সাঁওতালদের গ্রামটা পেয়ে গেল। কিন্তু সেই গ্রামে একটাও দোকান নেই। গ্রামের লোকেরা খুব গরিব, তারা কোনোদিনই বোধহয় মুর্গীর ঝোল আর ভাত খায় না।

দোকান নেই দেখে স্বপনের খিদে উপে গেল। সে কিছুতেই কোনো বাড়িতে খাবার চাইবে না। লোকের কাছে খাবার চেয়ে খেতে তার লজ্জা করে।

একটা কুঁড়েঘরের সামনে একজন বুড়ো সাঁওতাল রোদ্দুরে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। সে ওদের জিজ্ঞেস করল, "বাবুরা কোথায় যাবে?"

বিমান বলল, "এই এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি।"

বুড়ো বলল, "ঐ যে বটগাছটি দেখছ, ওর পাশ দিয়ে চলে যাও, ঝাঁঝা যাবার রাস্তা পেয়ে যাবে!"

বিমান বলল, "ঝাঁঝা? ঝাঁঝা এদিকে নাকি?"

বুড়ো দু বার মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ গো। এই পাঁচ ক্রোশ পথ হবে।"

একবার ট্রেনে দ্বারভাঙ্গা যাবার সময় বিমান ঝাঁঝা নামে একটা স্টেশন দেখেছিল। সেটা এখানে নাকি?

স্বপন বলল, "ঝাঁঝা তো শিমুলতলার পরের স্টেশন! চল, সেখানে যাবি? ঝাঁঝার রসগোল্লা খুব বিখ্যাত!"

বিমান তাকে একটু ধমক দিয়ে বলল, "তোর খালি অন্য কথা! এখন ঝাঁঝায় আমরা রসগোল্লা খেতে যাব? কেন, কলকাতায় রসগোল্লা পাওয়া যায় না? পাঁচ ক্রোশ মানে জানিস? দশ মাইল! অতখানি রাস্তা হেঁটে যাব রসগোল্লা খাবার জন্য?"

স্বপন বলল, "তবু তো সেখানে গেলে কিছু খাবার পাওয়া যাবে। তোর ঐ পাহাড়ে উঠলে কী পাওয়া যাবে? কিছু না!"

বুড়ো সাঁওতালটির বাড়িটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার, ঝকঝকে। ঘরের বাইরে মাটির দেয়ালে সাদা রং দিয়ে একটা ছাগলের ছবি আঁকা। কিংবা হয়তো হরিণ আঁকতে চেয়েছিল, ছাগল হয়ে গেছে।

বাড়িটার উঠোনে তিনটি কলাগাছ। তার মধ্যে একটা গাছে এক কাঁদি কলা ঝুলে আছে। পেকে গেছে কলাগুলো। বিমান এর আগে কোনো গাছে পাকা কলা ঝুলতে দেখেনি। বিমান সেই দিকে তাকিয়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে কোনো দোকান নেই, যেখানে কলা-টলা কিনতে পাওয়া যায়?"

বুড়ো বলল, "তোমরা কলা কিনবে? আমার কাছ থেকে কেনো। এক টাকা পুরো দিতে হবে কিন্তু!"

"এক টাকায় কটা?"

"আমাকে এক টাকা দাও, তোমরা যে-কটা ইচ্ছে ছিঁড়ে নিয়ে যাও!"

এ তো বেশ মজার ব্যাপার। এক টাকায় তারা যে-কটা ইচ্ছে কলা নিতে পারে। যদি সবগুলো নেয়? তবে সবগুলো নিল না অবশ্য, ওরা দুজনে চারটে করে পাকা কলা ছিঁড়ে নিল। বেশ বড়-বড় কলা।

বুড়ো বলল, "তোমরা একটু তাড়াতাড়ি চলে যাও বাবু! আমার ছেলে এসে পড়লে আবার আমাকে বকাবকি করবে!"

বিমান বলল, "আমরা ঝাঁঝায় যাব না। আমরা পাহাড়ে উঠব। দুদ্ধবাবুর মকান আছে যে-পাহাড়ে, সেটাতে যাবার রাস্তা আছে এদিক দিয়ে?"

বুড়োর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। সে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "ওদিকে যেও না। ওখানে পরমাত্মারা থাকেন।"

স্বপন বিমানের দিকে চেয়ে চোখের ইসারা করল। বিমান বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "পরমাত্মারা থাকলে কী হয়? তারা কি মানুষকে মেরে ফেলে?"

বুড়ো বলল, "পরমাত্মারা রাগ করলে বাড়িতে আগুন লাগে।"

"আমাদের বাড়ি অনেক দূরে। সেখানে আগুন লাগবে না। তুমি কোনোদিন উঠেছিলে সেই পাহাড়ে?"

বুড়ো বলল, "বাবু, তোমরা এখন যাও না! আমার ছেলে এসে পড়লে আমাকে বকবে সে!"

ওরা দুজনে কলা খেতে-খেতে আবার এগোল নদীর দিকে। স্বপন হাসতে হাসতে বলল, "বুড়োটা খুব মজার, তাই না?"

"আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল।"

"সেজন্য নয়। বারবার বলছিল, আমরা থাকতে-থাকতে ওর ছেলে এসে গেলে ওকে বকবে। কেন বল্ তো?"

"কেন?"

"আমাদের কাছ থেকে কলার দাম হিসেবে এক টাকা নিল তো! ছেলেকে সে-কথা বলবে না। ছেলেকে বলবে বাঁদর-টাঁদর এসে কলা খেয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ রে, নইলে আমাদের চলে যেতে বলছিল কেন? ওর ছেলে আমাদের দেখলেই সব বুঝে ফেলত!"

"এরা খুব পরমাত্মার ভয় করে দেখছি!"

"ভয় জিনিসটা খুব ভাল। তাতে বেশী কষ্ট করতে হয় না। দ্যাখ্ না, তুই যদি পরমাত্মার নাম শুনে ভয় পেতি, তাহলে আর তোকে কষ্ট করে ঐ পাহাড়ে উঠতে হত না!"

কলাগুলো খেয়ে ওদের পেট অনেকটা ভরে গেল। নদীটার কাছে এসে বিমান ওর বোতলে সেই নদীর জলই ভরে নিল খানিকটা। নদীর জলে স্রোত আছে। যে জলে স্রোত থাকে, তা কখনো খুব অপরিষ্কার থাকে না।

নদী পেরিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল ডান দিকে। পাশাপাশি পাহাড় দুটো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই বাড়িটা এখনো চোখে পড়ে না। বাড়িটা সত্যিই তাহলে পাহাড়ের উল্টো দিকে।

এখানকার মাটি ক্রমেই উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা যাবার পর ওরা দেখল, সামনে একটা জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল নয়, কিন্তু অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পাহাড় দুটোর কাছে

যেতে হলে এই জঙ্গলটা পেরিয়ে যেতে হবে। ওরা যেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, তখন আর পাহাড় দুটোও দেখা গেল না।

স্বপন বলল, "এইবার আরও মজা হবে। এবার আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলব। তারপর জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরতে থাকব। হয়তো চলে যাব পাহাড়টার উল্টো দিকে।"

বিমান বলল, "এরা বলছে বাড়িটা দুশ্যবাবুর। কেউ বলেছিল ওটা পুতুলডাঙা না কোথাকার যেন রাজার বাড়ি। কিন্তু সেই সময় তারা যাতায়াত করত কী করে? নিশ্চয়ই অনেক লোকজন যেত ঐ বাড়িতে, তার জন্য রাস্তা থাকবে না?"

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই অন্যদিক থেকে রাস্তা আছে। বুঝতে পারছিস না, আমরা উল্টো দিক থেকে এসেছি। এদিক থেকে বাড়িটা দেখাই যায় না! চল্, আমরা ফিরে যাই! কাল সকালে আমরা ট্রেনে করে ঝাঁকা যাব, তারপর সেদিক থেকে ঠিক রাস্তা পেয়ে যাব!"

বিমান গম্ভীর ভাবে বলল, "আমি একবার বেরিয়ে পড়ে কক্ষনো ফিরি না!"

"ঠিক আছে, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে মরবি, তখন ভাল হবে!"

"কিছুতেই রাস্তা হারাব না। আমি সোজা এই দিকে যাব, একটুও বেঁকব না।"

"গাছগুলো কি ভেদ করে চলে যাবি নাকি?"

"পাশ কাটিয়ে যাব। কিন্তু কিছুতেই দিক বদলাব না।"

জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এগোতেই হঠাৎ দড়াম করে একটা গুলির শব্দ হল। অনেকগুলো পাখি উড়ে গেল ঝট-পটিয়ে।

গুলির শব্দ শুনে ওরা ভয় পাবার বদলে অবাকই হয়েছে বেশী। এই সাধারণ জঙ্গলে দিনের বেলা কে গুলি করবে? কোনো শিকারী এসেছে শিকার করতে? এই জঙ্গলে কি সেরকম কোনো জন্তু-জানোয়ার আছে?

দুই বন্ধু চোখাচোখি করল একবার।

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই বাঘ!"

বিমান বলল, "গুলির শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল, বল তো?"

স্বপন চারদিকে মাথা ঘোরাল। ঠিক বোঝা যায় না। শব্দ যেদিক থেকে আসে, তার উল্টোদিক থেকে প্রতিধ্বনি বেশী হয়।

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই এখানে কেউ বাঘ-টাঘ শিকার করতে এসেছে। আমরা হয় বাঘের সামনে পড়ব, না হয় শিকারীর গুলি খেয়ে মরব।"

বিমান বলল, "হয়তো বাঘ না, কেউ পাখি শিকারেও আসতে পারে। কিন্তু শিকারীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, আমরা এখানে আছি।"

বিমান চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্বপন বলল, "দ্যাখ দ্যাখ!"

সে একটা গাছের দিকে হাত তুলে দেখাল। গাছের গুঁড়ির খানিকটা চাকলা উড়ে গেছে। এক্ষুনি। কারণ, এখনো রস গড়াচ্ছে। গাছটা ওদের খুবই কাছে।

স্বপন চোখ বড় বড় করে বিমানের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুলিটা কি তা হলে আমাদের দিকেই ছুঁড়েছিল? ফসকে গিয়ে এই গাছে লেগেছে?"

বিমান বলল, "না! মানুষকে কেউ ইচ্ছে করে গুলি করে নাকি? নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পায়নি!"

"কিন্তু গুলিটা আমাদের গায়ে লাগলে কী হত?"

"মরে যেতাম, আর কী হত! বোকা কোথাকার!"

স্বপন সঙ্গে সঙ্গে বিমানের হাত টেনে মাটিতে শুয়ে পড়ল! সেই টানের চোটে বিমান প্রায় ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে। একটু রেগে গিয়ে বলল, "এটা কী ব্যাপার হল?"

স্বপন ফিসফিস করে বলল, "আবার যদি কেউ গুলি চালায়? মাটিতে শুয়ে পড়লে সহজে গুলি গায় লাগে না, জানিস না! আমি বোকা থাকতে চাই, মরতে চাই না!"

দুজনে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল মাটিতে। কান খাড়া। কিন্তু আর কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। গুলির আওয়াজ তো দূরের কথা, কোনো লোকের হাঁটা চলার আওয়াজও না। শুধু টি-টি-টি-টি করে একটা পাখি ডাকছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। খুব সাবধানে চারদিকে তাকাল। না, কেউ নেই।

স্বপন বলল, "এবার কি আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত না?"

বিমান সংক্ষেপে বলল, "না।"

সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ঠিক যেন মাটির ওপর একটা দাগ কাটা আছে, সেইরকম ভাবে সে সোজা হাঁটছে। স্বপনও তার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এল। বিমান আর কোনো কথা বলছে না। স্বপন শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, "যদি এই বনে বাঘ থাকে?"

বিমান বলল, "তুই চিড়িয়াখানার খাঁচার বাইরে আর কোথাও বাঘ দেখেছিস?

"না।"

"তা হলে আজ আমাদের বাঘ দেখা হয়ে যাবে!"

"আমরা বাঘ দেখব, আর বাঘও আমাদের দেখবে। তারপর?"

"তুই বড্ড বাজে কথা বলিস, স্বপন!"

"আমার একদম মরে যেতে ভাল লাগে না!"

"মরা অত সোজা নয়। আচ্ছা, তুই জানলি কী করে যে মাটিতে শুয়ে পড়লে গায়ে গুলি লাগে না?"

"বই পড়ে! বই পড়েই আমার সব কিছু জানতে বেশী ভাল লাগে। এমন কী, বনের মধ্যে সত্যিকারের বাঘ দেখার বদলে বইতে বাঘের গল্প পড়া অনেক ভাল!"

আরও বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পরও ওরা কোনো বাঘ দেখতে পেল না বটে, কিন্তু একজন মানুষকে দেখল। একটা শাল গাছে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, তার কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বন্দুক।

লোকটার খালি গা, কোমরে একটা ছোট্ট কাপড়। লোকটার কী দারুণ সুন্দর চেহারা! তার কালো রঙের শরীরটা যেন পাথরের তৈরি। বুকটা চকচক করছে। লোকটা ওদের দেখে একটুও নড়ল না, চড়ল না, একটা কথাও বলল না। এমন কী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ওরাও প্রথমে কোনো কথা বলল না। একটু দূরে লোকটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। স্বপনের একবার শুধু মনে হয়েছিল, লোকটা হয়তো কাঁধ থেকে বন্দুকটা নিয়ে আবার গুলি করবে। তা হলেই ও বিমানের হাত ধরে মাটিতে শুয়ে পড়বে।

লোকটা কিন্তু বন্দুকটাও আর নামাল না।

বিমান আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপ পাখি শিকার করতা হ্যায়?"

লোকটা কোনো উত্তর দিল না।

স্বপন বলল, "এখানকার সাঁওতালরা সবাই বাংলা বোঝে।"

তারপর সে নিজেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি, মানে, আপনি একটু আগে গুলি করেছিলেন?"

লোকটা তবুও কোনো উত্তর দিল না।

বিমান বলল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?"

তবু কোনো উত্তর নেই।

"একটু আগে কে গুলি করেছে?"

"গুলি আমাদের গায়ে লাগতে পারতো!"

লোকটি কিছুতেই একটাও শব্দ করল না। ঠিক মনে হয় যেন পাথরের মূর্তি। পাথরের নয় অবশ্য, কারণ ওর নিশ্বাস পড়ছে।

স্বপন বলল, "লোকটা নিশ্চয়ই বোবা। যারা বোবা হয় তারা কালাও হয়। ও আমাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না।"

বিমান বলল, "একটা বোবা-কালা লোক এখানে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

আরও কিছুক্ষণ ধরে ওরা লোকটাকে অনেক প্রশ্ন করল। অনেক ভাবে চেষ্টা করল কথা বলাবার। কিন্তু লোকটা একেবারে চুপ। একটু নড়াচড়াও করছে না।

শেষ পর্যন্ত বিমান বিরক্ত হয়ে বলল, "যাক গে, আর দেরি করবার কোনো মানে হয় না। চল আমরা যাই!"

লোকটাকে ফেলে রেখে ওরা আবার এগিয়ে গেল। খানিকটা দূর গিয়ে ওরা মাথা ঘুরিয়ে দেখল, লোকটা এবার পেছন ফিরে ওদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কী রকম অদ্ভুত চোখ, মনে হয় যেন পলক পড়ছে না।

স্বপন বলল, "বিমান, ঐ লোকটা যদি পেছন থেকে হঠাৎ গুলি করে? চল দৌড়োই!"

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে খুব জোরে ছুটল। বিমানই বেশী জোরে দৌড়য়। এর মধ্যে আবার স্বপনের চশমাটা খুলে পড়ে গেল একবার। কিন্তু ওরা অনেক দূর চলে এসেছে, লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার আর খানিকটা দৌড়তেই বন শেষ হয়ে গেল। সামনেই সেই দুটো পাহাড়। বিমান বনের মধ্যেও রাস্তা ঠিক রেখেছে, অন্য দিকে চলে যায়নি।

কোনো পাহাড়ের ওপরেই সেই বাড়িটা নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, বাড়িটা কি অদৃশ্য হয়ে যাবে? তা হতেই পারে না।

বিমান বলল, "আমি এই ডান দিকের পাহাড়টা ঘুরে সামনের দিকে যেতে চাই। তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িটা দেখতে পাব।"

স্বপন বলল, "তারপর ঐ দিকে গিয়ে দেখব, বাড়িটা বাঁ দিকের পাহাড়ে। তখন আবার উল্টো ঘুরে আসতে হবে।"

"তা হলে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাই?"

"সেটা মন্দ না।"

কিন্তু দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। সেখানটা এবড়োখেবড়ো পাথর আর কাঁটাগাছে ভর্তি। এত বেশী কাঁটাগাছ যে তার মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায় না। বরং ডান পাশের পাহাড়ের দিকটাতেই একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা আছে মনে হল।

বিমান বলল, "আমি এই দিকেই যাব। যদি উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হয়, তাও ভাল।"

এবার স্বপনই একটা জিনিস আবিষ্কার করল। খানিকটা এসে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিঁড়ি! ঐ দ্যাখ! আমি বলেছিলাম না, পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি থাকবে?"

সত্যি, এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খাঁজ-কাটা-কাটা সিঁড়ি আছে।

বিমান বলল, "পাহাড়ের ওপর বাড়ি থাকলে তো পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি থাকবেই। সব জায়গাতেই থাকে।"

স্বপন বলল, "দেখিস, আমার সব কথা মিলে যাবে! আমি মনে মনে যা দেখেছিলাম, এখানে এসেও তুই তাই দেখবি!"

দুজন এবার বেশী উৎসাহ পেয়ে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। স্বপন অবশ্য খানিকটা গিয়েই থেমে গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, "বিমান, আস্তে চল, পাহাড়ের ওপর দৌড়তে নেই, তা হলে দম ফুরিয়ে যায়!"

বিমান সে-কথা শুনল না। সে-ই আগে উঠে গেল পাহাড়ের ওপর।

স্বপন যখন এসে পৌঁছল, তখন বিমান সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়িটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে এখন। রীতিমতন বিশাল বাড়ি। খুব একটা ভেঙে-টেঙেও যায়নি। ছাদের কাছে দেয়াল থেকে কয়েকটা গাছ বেরিয়েছে—সেখানকার দেয়ালে ফাটল ধরেছে। দেখেই বোঝা যায়, অনেকদিন এ-বাড়িতে মানুষজন থাকেনি।

ওরা অবশ্য এসে পৌঁছেচে বাড়িটার পেছন দিকে। এদিকটা মস্ত বড় একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এদিক দিয়ে বাড়িতে ঢোকা যাবে না।

ওরা ঘুরে বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছল। এখানে অনেকখানি বাগানের মতন জায়গা। নিশ্চয়ই এক সময় অনেক ফুলটুলের গাছ ছিল, কারণ ছোট-ছোট ইঁট দিয়ে দিয়ে সব জায়গা ভাগ করা আছে। একটা ফুলগাছও এখন নেই। সব শুকিয়ে গেছে—শুধু মাঝখানে একটা বড় গাছ।

স্বপন সেই গাছটার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, "কী, আমি বলেছিলাম না, সামনে একটা ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা গাছ থাকবে? এই দ্যাখ, মিলে গেছে!"

বিমান কাছে এসে ভুরু কুঁচকে সেই গাছটা দেখল। সে ঠিক বিশ্বাস করল না। বলল, "এটা তোর ঐ সেই গাছ?"

"নিশ্চয়ই!"

"কিন্তু তুই যে বলেছিলি, হাঁসের ডিমের মতন সাদা সাদা ফুল হয়? কোথায় সেই ফুল?"

"বাঃ, এখন ফুল ফোটেনি।"

"আমার তো দেখে মনে হচ্ছে এটা কাঁঠাল গাছ!"

"মোটেই না। তাহলে কাঁঠাল কোথায়?"

"এখনো কাঁঠাল হয়নি!"

মোট কথা, ওটা ম্যাগনোলিয়া না কাঁঠাল গাছ, তা ঠিক করা গেল না। কারণ ওরা দুজনে কেউই ভাল গাছ চেনে না। কাজেই কেউই নিজের মতটা বলতে পারল না জোর দিয়ে।

স্বপন অবার হাত ছুঁড়ে বলল, "ঐ দ্যাখ! সদর দরজায় মস্ত বড় তালা ঝুলছে। এ-কথাটাও আমি বলেছিলাম কিনা?"

বিমান বলল, "ফাঁকা বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া থাকবে না? এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারে।"

স্বপন বলল, "আ-হা-হা! দরজাটা তো একদম ভাঙাও থাকতে পারত। যে-বাড়িতে অনেকদিন মানুষ থাকে না, সে-সব বাড়ির দরজা জানলা সব ভাঙা থাকে।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, এবার দেখা যাক, তুই যে ভাঙা জানলাটার কথা বলেছিলি, সেটা পাওয়া যায় কিনা!"

প্রথমে বিমান এসে সদর-দরজার তালাটা পরীক্ষা করল। তালাটা বেশ বড়, ভাঙা যাবে না। তারপর সে এদিক-ওদিক তাকাল।

স্বপন তার কাঁধে এসে হাত দিয়ে বলল, "একটা কথা কিন্তু আগে মনে পড়েনি। খুব সীরিয়াস!"

বিমান বলল, "কী?"

"এটা অন্য লোকের বাড়ি। দরজায় তালা বন্ধ। এই বাড়িতে কি আমাদের ঢোকা উচিত?"

"কেন?"

"বাঃ, পরের বাড়িতে কেউ না বলে-কয়ে ঢোকে নাকি? সে তো চোরেরা ঢোকে!"

বিমান খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "আমরা তো আর চোর নই। আমরা কিছু নিতেও আসিনি। এ-বাড়িতে তো এখন আর কেউ থাকে না, এখন আমরা ঢুকলে কী হয়েছে?"

স্বপন বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় ঢোকা উচিত না।"

এবার বিমান একটু অনুনয় করে বলল, "এতদূর এসেও ভেতরটা না দেখে চলে যাব? আমার পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখতে খুব ভাল লাগে। স্বপন, একবার একটু দেখে এলে কী দোষ হয়েছে, বল?"

স্বপন বলল, "যদি সত্যিই কোনো জানলা-টানলা ভাঙা থাকে, তবেই কিন্তু ঢুকব। মানে ভেতরে ঢোকার যদি রাস্তা আগে থেকেই থাকে। আমরা নিজেরা কিছু ভেঙে ঢুকব না।"

বিমান বলল, "চল, দেখাই যাক না।"

যাবার আগে স্বপন একবার উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এত উঁচু থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। চতুর্দিকেই পাহাড়। এরই মধ্যে এক জায়গায় রেল-লাইন, তার ওপর দিয়ে ঠিক এই সময়েই একটা ট্রেন যাচ্ছে। এত দূর থেকে ঠিক মনে হয় খেলনার ট্রেন।

অনেক পাহাড়ই দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু কোনটা যে লাটু পাহাড় সেটা বোঝবার উপায় নেই। মাথার ওপর অনেকখানি ছড়ানো আকাশ। এখন একেবারে লক্লক্ করছে দুপুরের রোদ।

বিমানের কিন্তু আকাশ দেখার ধৈর্য নেই।

সে বাড়িটার পাশের দিকে এগোল। সদর দরজার দুপাশে দুটো জানলা। দুটোই বন্ধ। বিমান একটা জানলা টেনে দেখল। না, খোলা যাবে না।

৪

সামনের দালানে কয়েকটা মোটা-মোটা থাম। সে থামের গায়ে পেন্সিলে কী সব হিজিবিজি লেখা। স্বপন সেগুলো পড়ার চেষ্টা করল। বাংলাতেই কতকগুলো লোকের নাম লেখা, জয়নন্দন, দেবকীপ্রসাদ, বুলো, কানাই। এক জায়গায় লেখা আছে 'শুক্রবার, দুপুর দেড়টা'। স্বপন একটু চমকে গেল, আজও তো শুক্রবার, আর এখন দুপুর দেড়টার কাছাকাছিই হবে।

দূরে ঘটাং করে একটা শব্দ হল। বিমান চেঁচিয়ে ডাকল, "এই স্বপন, এদিকে আয়।"

স্বপন দৌড়ে বাড়িটার ডান পাশে ঘুরে গিয়ে দেখল, বিমান একটা খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জানলাটার একটাও শিক নেই।

স্বপন নিজেও এতটা আশা করেনি। তার সব কথা মিলে যাচ্ছে। সে সত্যিই চোখ বুজলে অনেক কিছু দেখতে পায়, কিন্তু সব সময় তো সব জিনিস মেলে না। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগের দিন সে চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর, অঙ্কের কোশ্চেন পেপারটা দেখতে পেয়েছিল পুরোপুরি। কিন্তু পরীক্ষায় তার থেকে অঙ্ক এসেছিল মোটে দুটো।

বিমান বলল, "এই জানালাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আয়, ভেতরে ঢুকি।"

ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ স্বপনের একটু গা-ছমছম করে। এর ভেতরে কী আছে কে জানে।

বিমানই প্রথমে পা বাড়াল ভেতরে। তারপর সে হাততালি দিয়ে হুশহুশ শব্দ করে উঠল।

স্বপন জিজ্ঞেস করল, "ওরকম করছিস কেন?"

"দেখছি, প্যাঁচা আছে কিনা। তুই বলেছিলি না প্যাঁচা থাকবে?"

অন্ধকারের মধ্যে কোনো জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল না। কিন্তু দূরে পাশের কোনো ঘরে রুনঝুন শব্দ হল। যেন কাচের চুড়ির আওয়াজ। ওরা কান পেতে সেই শব্দ শুনল। শব্দটা অবশ্য থেমে গেল তক্ষুনি।

স্বপন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বাড়িতে অন্য কোনো লোক আছে মনে হচ্ছে!"

বিমান বলল, "সদরদরজা বন্ধ, ভেতরে লোক থাকবে কী করে?"

"তা হলে কিসের শব্দ হল?"

"দেখা যাক!"

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে যাবার দরজাটা পাওয়া গেল। সেটাও খোলা। দরজা ঠেলে এ-পাশে আসতেই অন্ধকার কেটে গেল। দু'পাশে দুটো লম্বা টানা বারান্দা, তার পাশে অনেকগুলো ঘর। মাঝখানে চৌকোমতন উঠোন। ওপর থেকে সেই উঠোনে রোদ এসে পড়েছে।

কাচের সেই রুনঝুন শব্দটা এখন আর-একবার শোনা গেল। মনে হয় অন্য কোনো ঘর থেকে। বিমান আর-একটা ঘরের দরজা ঠেলে দেখল। ফাঁকা ঘর। তার পরেরটাও তাই।

স্বপন এসে উঠোনে দাঁড়াল। ওপরে তাকালে আকাশ দেখা যায়। বাড়িটা মস্ত বড়, দোতলা তিনতলাতেও ঐ রকমই অতগুলো ঘর। স্বপন ওপরের বারান্দাগুলো দেখছে, হঠাৎ তার বুক কেঁপে উঠল। দোতলার বারান্দায় একটা মুখ তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। মুখটা মোটেই সাধারণ মানুষের মতন নয়, তার থেকেও বড়, কুচকুচে কালো রং, হিংস্র দুটি চোখ।

স্বপনের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এরকম ভয়ঙ্কর মুখ সে আগে কখনো দেখেনি। অনেকটা মা দুর্গার পায়ের নীচে যে মহিষাসুরের মূর্তি থাকে, তার মুখের মতন। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে চলে এল বারান্দায়। তারপর বিমানের হাত ধরে বলল, "শিগগির চল্!"

বিমান কিছুই বুঝতে পারল না। সে বলল, "কী হয়েছে। কী ব্যাপার?"

"চল, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। এক মুহূর্তও আর এখানে নয়!"

বিমান জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "কী ব্যাপার আগে বল। পালাব কেন?"

স্বপন কোনো রকমে বলল, "ওপরে কে একজন...... আমাদের দেখছে......খুব হিংস্র!"

বিমান উঠোনে এসে ওপরে তাকাল, চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল খুব ভাল করে। তারপর বলল, "কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!"

স্বপন তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে। সে ভাবছে, এক্ষুনি কেউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে।

কিন্তু কেউ এল না।

বিমান বলল, "কই, কেউ নেই তো! তুই ভুল দেখেছিস।"

"মোটেই আমি ভুল দেখিনি!"

"চল, তা হলে ওপরে গিয়ে দেখে আসি।"

"বিমান, এই ধরনের খালি বাড়িতে অনেক সময় চোর ডাকাতের আড্ডা হয়।"

"সেই আড্ডাটাই তা হলে একবার দেখে যাওয়া দরকার।"

বিমান তখুনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়িটা সোজা উঠে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। কাঠের সিঁড়ি, মাঝে মাঝে পেতলের আংটা বসানো। তার মানে এক সময় এই সিঁড়িতে কার্পেট পাতা থাকত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মচমচ শব্দ হচ্ছে।

ওরা ওপরে উঠে এসে দেখল, ওপরেও একটা লম্বা টানা বারান্দা একদম ফাঁকা। ওরা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই, তবু গা'টা কী রকম ছমছম করে। একটু আগে স্বপন এখানে একটা বিচ্ছিরি মানুষের মুখ দেখেছিল। তা কখনো চোখের ভুল হতে পারে?

স্বপন বারান্দার মেঝেটা ভাল করে দেখতে লাগল। একটু আগে বারান্দার ওপর দিয়ে কোনো লোক হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই ধুলোর ওপর তার পায়ের ছাপ থাকবে। কিন্তু তা নেই। এরকম একটা ফাঁকা বাড়ির মেঝেতে যত ধুলো থাকা উচিত ছিল, তাও নেই, বরং বেশ পরিষ্কারই মনে হয়। শুধু কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া কাগজ এখানে সেখানে ছড়ানো।

বিমান কয়েকটা কাগজের টুকরো তুলে তুলে দেখতে লাগল। একটা বড় কাগজ তুলে নিয়েই সে বলল, "এই দ্যাখ, স্বপন!"

কাগজটার একদিক সাদা, আর এক দিকে একটা মুখোশ। একটা ভয়ংকর চেহারার মানুষের মুখ আঁকা। হ্যাঁ, স্বপন এই মুখটাই দেখেছিল।

স্বপন বলল, "এই তো! এই মুখোশ পরেই কেউ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।"

বিমান সঙ্গে-সঙ্গে পেছন ফিরে চারদিকটা একবার দেখে নিল। না, কোনো লোক নেই তো! কোনো লোক শুধু শুধু মুখোশ পরে তাদের ভয় দেখাবে কেন?

বিমান বলল, "আমার মনে হয়, এই মুখোশ-আঁকা কাগজটা উড়ে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ আটকে ছিল, তুই তখন দেখেছিস।"

স্বপন বলল, "তারপর আমাদের ওপরে উঠতে দেখেই মুখোশটা আবার আপনা আপনি বারান্দায় এসে পড়ে রইল?"

"তা ছাড়া আর কী হবে? হাওয়াতে এরকম হতেই তো পারে।"

"আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আমার একদম ভাল লাগছে না এ-জায়গাটা। দেখা তো হয়ে গেছে, এবার চল্।"

"দাঁড়া, আর-একটু দেখে নিই!"

স্বপন সেই মুখোশটা মুড়ে তার ঝোলার মধ্যে রেখে দিল।

এই সময় কাছেই একটা ঘরের মধ্যে শব্দ হল, ঠক্ ঠক্ ঠক্। তারপরই মেয়েদের হাতের চুরির মতন রুনঝুনু আওয়াজ।

স্বপন বিমানের হাত চেপে ধরল। এবার বিমানও একটু ঘাবড়ে গেছে। সে সেই ঘরের দরজাটার দিকে চোখ রেখে আস্তে-আস্তে নিজের কোমর থেকে বেল্টটা খুলে হাতে নিল। এইটাই তার অস্ত্র।

সে চাপা গলায় বলল, "স্বপন, তুই এক পাশে সরে দাঁড়া। আমি দরজাটা খুলছি, ভেতরে কী আছে দেখতে হবে!"

দরজাটা ভেতর থেকে খিল বন্ধ আছে ভেবে, বিমান খুব জোরে লাথি কষাল। সেই ঝোঁকে সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কারণ দরজাটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বপন পাশ

থেকে খপ্ করে বিমানের হাত ধরে ফেলল বলে সে পড়ে গেল না। ঘরের মধ্যে তখন খট্ খট্ ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ আরও জোরে চলছে।

ঘরের মধ্যে প্রথমেই ওদের চোখে পড়ল, তুলো উড়ছে। একটা বড় গোল টেবিলের ওপর কয়েকটা তাকিয়া আর বালিশ রাখা। সেগুলোর চারদিকে ফুটো হয়ে তুলো বেরিয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে লোকজন কেউ নেই।

বিমান বলল, "তুলো! স্বপন তুই বলেছিলি না, এ বাড়ির মধ্যে তুলো থাকবে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

"এই দ্যাখ, তুলো রয়েছে। তোর সাধারণ বুদ্ধিটা বেশ জোরালো। একটা খালি বাড়িতে কী কী থাকতে পারে, তা তুই ঠিক আন্দাজ করতে পারিস।"

"কিন্তু এটা খালি বাড়ি নয়। শব্দ হচ্ছিল কিসের?"

"সেটা দেখতে হবে।"

ওরা ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই বালিশের ফুটোর মধ্য থেকে বেরিয়ে দুটো বিরাট ইঁদুর মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে পালাল। সারা মেঝেতে কাচ ছড়ানো। একটা বড় আয়নার কাচের টুকরো। ইঁদুরগুলো তার ওপর দিয়ে দৌড়বার সময় ঝন্‌ঝন্ শব্দ হচ্ছে।

বিমান বলল, "সাবধান! এখানে অনেক ধাড়ী ধাড়ী ইঁদুর আছে!"

ঘরের কোণে একটা নর্দমার ঝাঁঝরি নেই। ইঁদুরগুলো সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

বিমান বলল, "ইঁদুররা তুলো ঘাঁটতে ভালবাসে। আমি আগেও দেখেছি।"

স্বপন বলল, "একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ, কী রকম যেন একটা গন্ধ।"

ঘরটা বেশ বড়। বড় গোল টেবিলটা ছাড়া সেই ঘরে রয়েছে একটা ছবির ফ্রেম। এক সময় তাতে কোনো আঁকা-ছবি ছিল, কে যেন ইচ্ছে করে ছবিটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে মনে হয়। যেন একটা ছুরি দিয়ে সেটাকে ফালা-ফালা করেছে। কী ছবি যে ছিল, এখন আর তা বোঝাই যায় না।

সেই ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওদের পায়ের কাছ থেকে ভন্ ভন্ করে এক ঝাঁক মাছি উড়ে গেল। নাকে এসে লাগল একটা বোঁটকা গন্ধ। ওরা নীচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল।

প্রথমে মনে হচ্ছিল একটা মোটা দড়ি। তারপরেই বোঝা গেল, দড়ি নয়, সাপ। একটা মরা সাপ, পচে গেছে, সেটার গায়েই মাছি বসেছিল!

শুধু গন্ধের জন্যই নয়, ঐ পচা সাপটাকে দেখেই ওদের প্রায় বমি এসে গেল। ওরা পিছিয়ে এল খানিকটা।

বিমান বলল, "সাপ? এখানে সাপ এল কী করে? অদ্ভুত ব্যাপার!"

স্বপন বলল, "কেন, ফাঁকা বাড়িতে সাপ আসতে পারে না? ঐ ইঁদুরগুলোকে খাওয়ার লোভে সাপ এসেছিল।"

"দোতলার ওপর সাপ আসে? তাও, ইঁদুরগুলো মরল না, সাপটাই মরে গেল?"

"ইঁদুরগুলোই বোধহয় সবাই মিলে আক্রমণ করে ওকে মেরে ফেলেছে।"

"অসম্ভব! ইঁদুরের সে সাহস হবে না কোনোদিন।"

"তাহলে বোধহয় সাপটা অনেক ইঁদুর খেয়ে-খেয়ে এমন পেট ভরিয়ে ফেলেছিল যে, শেষকালে পেট ফেটে মরে গেছে।"

"কিংবা কেউ সাপটাকে পিটিয়ে মেরেছে।"

"সাপ মেরে কেউ ঘরের মধ্যে রেখে দেয় না। তা হলে যে মেরেছে সে নিশ্চয়ই মরা সাপটাকে বাইরে ফেলে দিত।"

"চল, এই ঘর থেকে যাই।"

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সেই সময়।

দুই বন্ধু দুজনের চোখের দিকে তাকাল। বাইরে থেকে কেউ দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই।

বিমান দৌড়ে গেল দরজাটা খোলবার জন্য। আর স্বপন উঃ শব্দ করে পা চেপে বসে পড়ল, মাটিতে। তার পায়ে কী যেন কামড়ে দিয়েছে। একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল তার পাশ দিয়ে।

নর্দমা দিয়ে ইঁদুরগুলো আবার উঠে আসছে। বিমান সেদিকে চেয়ে বলল, "বেল্ট! স্বপন, বেল্ট খুলে ওদের মার।"

নিজে সে বেল্টটাকে চাবুকের মতন ধরে শপাশপ করে পেটাতে লাগল ইঁদুরগুলোকে। সারা ঘর ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেল। স্বপনও এবার উঠে দাঁড়িয়ে ইঁদুর পেটাতে শুরু করেছে। রীতিমতন একটা যুদ্ধ। একটু বাদে ইঁদুরগুলো আবার পালাতে লাগল নর্দমা দিয়ে।

দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ওরা সাবধানে আগে একটু বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল, কেউ আছে কিনা। কেউ নেই। তখন বাইরে বেরিয়ে এল।

বিমানের ভুরু কুঁচকে আছে। দরজাটা নিজে-নিজেই হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে, এটা সে মানতে পারছে না। ঠিক যেন মনে হল, কেউ দরজাটা টেনে বন্ধ করল।

সে বলল, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না রে, স্বপন! এ বাড়িতে সত্যিই কি কোনো মানুষ আছে? কেউ থাকলে এতক্ষণ আমরা টের পেতাম না?"

স্বপন বলল, "তা হলে এসব কাণ্ড হচ্ছে কী করে? প্রথমে একটা মুখোশ, তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া?"

"ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো?"

"এই দিনের বেলা ভূত আসবে! দূর! আমি ভূতের ভয় পাই না, মানুষকেই বেশী ভয় পাই। যদি কোনো চোর ডাকাত থাকে—"

বিমান গলা চড়িয়ে বলল, "চোর-ডাকাতকে ভয় পাবার কী আছে? আমরা যে এ-বাড়িতে এসেছি, তা তো অনেকেই জানে। আমাদের কোনো বিপদ হলে সবাই খুঁজতে আসবে এখানে। প্রিয়ব্রতদা পুলিশে কাজ করে। তার সঙ্গে তো আর কারুর চালাকি চলবে না!"

এ-কথা বলে বিমান চুপ করে গেল। তার এরকম চেঁচিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্য স্বপন বুঝে নিয়েছে। যদি কাছাকাছি কেউ থাকে, তাহলে কথাগুলো শুনবে।

ওরা কান পেতে রইল। না, তবুও কোনো লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না। সামনে পরপর অনেকগুলো ঘর, দরজাগুলো বন্ধ, যদিও বাইরে থেকে তালা দেওয়া নেই। প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যেই যেন কোনো রহস্য আছে। একতলার চেয়ে এই দোতলাতেই বেশী গা ছমছম করা ভাব। আড়াল থেকে কেউ যেন ওদের দেখছে।

বিমান বারান্দার এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত হেঁটে গেল। প্রায় দশখানা ঘর আছে এখানে। বারান্দার একেবারে ও-পাশে একটা দরজা খোলা। সেখানে কোনো ঘর নেই। একটা ছোট ছাদ। বিমান বলল, "স্বপন এদিকে আয়। এখান থেকে বাইরেটা দেখা যাবে!"

স্বপনের বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্‌ুলে ইঁদ্‌ুরটা কামড়ে দিয়েছিল, সেইখানটা বেশ জ্বালা করছে। একটা কিছ্‌ু ওষ্‌ুধ লাগালে হত।

ছাদটা গোল ধরনের। সামনের দিকটায় কাঠের রেলিং। বিমান সেই রেলিংয়ের কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখতে যাচ্ছে, স্বপন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "এই বিমান, ওদিকে যাস না!"

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী হয়েছে?"

"যাস না বলছি!"

বিমান তব্‌ু সে-কথা না শ্‌ুনে রেলিংটা ধরে ঝ্‌ুকতে যেতেই রেলিংয়ের খানিকটা অংশ হ্‌ুড়ম্‌ুড় করে ভেঙে পড়ল নীচে। বিমানও সেই সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল, স্বপন পেছন থেকে দৌড়ে তার জামাটা খামচে ধরল। ফ্যাস করে জামাটা ছিঁড়ে গেল, খানিকটা অংশ থেকে গেল স্বপনের হাতে। তব্‌ু সেইট্‌ুকু বাধা পাওয়াতেই বিমান সোজা নীচে পড়ল না, তার মাথাটা বেরিয়ে গেলেও হাত দিয়ে সে ছাদের কোণটা ধরে ফেলল।

স্বপন তার পা ধরে টেনে এদিকে নিয়ে এসে ধমক দিয়ে বলল, "বারণ করলাম না রেলিংটা ধরতে!"

বিমানের ব্‌ুকটা ধকধক করছে। এখান থেকে নীচে পড়লে আর দেখতে হত না। সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, রেলিংটা হঠাৎ এরকমভাবে ভেঙে পড়তে পারে।

সে স্বপনকে জিজ্ঞেস করল, "স্বপন, তুই আগে থেকে কী করে ব্‌ুঝলি? তুই কেন আমাকে ওখানে যেতে বারণ করলি রে?"

স্বপন বলল, "কী জানি! আমার হঠাৎ মনে হল, ওখানে একটা কিছ্‌ু বিপদ আছে। প্‌ুরনো কাঠের রেলিং, ব্‌ৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পচে গেছে।"

"কিন্তু দেখে তো বেশ শক্ত মনে হচ্ছিল।"

"আমি ঠিক ব্‌ুঝতে পেরেছিল্‌ুম!"

"তুই কী করে এত সব ব্‌ুঝতে পারিস! যাক গে, চল এবার যাই! আমার শখ মিটে গেছে। আর এখানে থাকতে চাই না।"

"বাঁচল্‌ুম। আমিও আর এখানে এক ম্‌ুহ্‌ূর্তও থাকতে চাই না?"

ছাদটা থেকে বেরিয়ে আবার ওরা বারান্দায় এল। এবার দেখা গেল, ওদের ঠিক পাশের ঘরটারই দরজা খোলা। একট্‌ু আগে ওরা দরজাটা বন্ধ দেখেছিল।

এই বাড়ির হাওয়া তো খ্‌ুব অদ্ভুত। যখন-তখন দরজা খোলে আর বন্ধ হয়! দরজাটা এমনভাবে খোলা যে, মনে হয় যেন ঘরটা ওদের ডাকছে ভেতরে ঢ্‌ুকে দেখবার জন্য।

বিমান দরজা দিয়ে ঘরটার মধ্যে শ্‌ুধ্‌ু ম্‌ুখ বাড়াল।

স্বপন তার হাত টেনে ধরে বলল, "আর দরকার নেই. চল্‌!"

বিমান বলল, "দ্যাখ, একটা অদ্ভুত জিনিস!"

সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত। ঘরটার এককোণে একটা বিছানা পাতা। সেই বিছানায় শ্‌ুয়ে আছে একটা কুকুর।

এই ঘরের ভেতরের দিকেও একটা দরজা আছে, যা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। সেই ঘরটা অন্ধকার।

কুকুরটা ওদের দেখে উঠল না, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।

স্বপন বলল, "বোধহয় বাইরে থেকে একটা কুকুর এসে এখানে ঢ্‌ুকে পড়েছে।"

বিমান বলল, "কুকুরটা কি এইমাত্র এল? এত ঘর থাকতে এই ঘরেই কেন? কে ওর জন্য বিছানা পেতে রেখেছে?

কুকুরের জন্য বিছানা? মাথায় বালিশ পর্যন্ত রয়েছে।"

বিমান বেল্টটা আবার হাতের মুঠোয় ধরে রাখল, বলা যায় না, কুকুরটা পাগলও হতে পারে।

স্বপন বলল, "চল না, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ?"

"কুকুরের জন্য কে বিছানা পেতে রেখেছে, তা আমি দেখতে চাই।"

বিমান ঘরের মধ্যে পা দিতেই কুকুরটা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। সাধারণ দিশী কুকুর। খুব একটা গাঁট্টাগোঁট্টাও নয়।

কুকুরটা কিন্তু ওদের দিকে তেড়ে এল না। খানিকক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে রইল। চোখের ভাব দেখলে মনে হয়, যেন সে বলতে চাইছে, কেন আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ? তারপর সে নিজেই শান্তভাবে লেজ গুটিয়ে মাঝখানের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

বিমান বিছানাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিছানাটা অবশ্য বহু পুরোনো, অনেক দিন আগে কেউ পেতে রেখে গেছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় তো কেউ বিছানা পেতে রেখে যায় না। বিছানার চাদরে-বালিশে শ্যাওলা ধরে গেছে—অনেকদিন এখানে কোনো মানুষ শোয় না, তা বোঝা যায়। কুকুরটাও কি আজই প্রথম এল?

বিমান বলল, "কুকুরটা কেন এখানে এল বল তো? আমাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে?"

স্বপন বলল, "খালি বাড়িতে অনেক সময়ই এরকম কুকুর এসে ঢুকে পড়ে।"

"কিন্তু যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে কুকুররা খাবার পাবে কী করে? এখানে কি কুকুরের কোনো খাদ্য আছে?"

"খাবার বাইরে গিয়ে খেয়ে আসে।"

"বাইরে খাবার খায়, আর এখানে বিছানায় শুতে আসে? কোনোদিন শুনেছিস এরকম কথা?"

"কুকুরটা গেল কোথায়?"

বিমান মাঝখানের দরজাটা দিয়ে অন্য ঘরটায় উঁকি দিল। এ-ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। ভেতরের কিছু দেখা যায় না। শুধু এককোণে জ্বল জ্বল করছে দুটো চোখ। অন্ধকারে সেই চোখ দুটো ভয়ংকর দেখায়।

কুকুরটাই ঐ রকম চোখে ওদের দেখছে। এবার হঠাৎ ঘাউ-ঘাউ করে ডেকে উঠল। সে কি গলার জোর! বাড়িটাতে কোনো শব্দ ছিল না, এবার কুকুরের ডাকে যেন কেঁপে উঠল সারা বাড়িটা!

বিমান চমকে পিছিয়ে আসতে গিয়ে ধাক্কা মেরে বসলো স্বপনকে। সেই ধাক্কায় স্বপনের চশমাটা পড়ে গেল মাটিতে। স্বপন আর চশমাটা তোলার সময় পেল না, তাদের মনে হল কুকুরটা তেড়ে আসছে তাদের দিকে।

দুজনেই দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কুকুরটাও দারুণ জোরে-জোরে ডেকে যাচ্ছে। বিমান বলল, "স্বপন, দৌড়ে নীচে নেমে চল।"

স্বপন বলল, "আমি দৌড়োব কী করে? তুই আমার চশমাটা ফেলে দিলি! চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না! চশমাটা নিয়ে আসতেই হবে!"

বিমান বলল, "এই রে! আবার ঢুকতে হবে ঐ ঘরে? কুকুরটা যদি পাগলা হয়?"

স্বপন বলল, "তা বলে আমি চশমাটা ফেলে মোটেই যাব না।"

"আমার মনে হয়, ঐ অন্ধকার ঘরটাতে এমন কিছু আছে,

কুকুরটা যা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের ঐ ঘরটায় ঢুকতে দিতে চায় না।"

"আমার চশমাটা তো পড়েছে এই ঘরে। আমি নিয়ে আসছি।"

কিন্তু স্বপনকে একলা ঐ ঘরে ঢুকতে দেওয়াটাই ভুল হল বিমানের। চশমা ছাড়া ও কিছু দেখতে পায় না চোখে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই ও হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও লাফিয়ে এসে পড়ল ওর ঘাড়ে।

বিমান সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে বেল্ট চালাতে লাগল কুকুরটার ওপরে। কুকুরটা তখন স্বপনকে ছেড়ে বিমানকে আক্রমণ করল। ছাড়া পেয়ে স্বপন মাটি হাতড়াতে লাগল। চশমাটা তার আগে চাই।

বিছানাটার ওপরে পেয়ে গেল চশমাটা। ভাগিস বিছানার ওপর পড়েছিল তাই ভাঙেনি। চশমাটা পরে নিয়ে স্বপন ঘরে তাকিয়ে দেখল, কুকুরটা বিমানের একটা পা কামড়ে

ধরেছে, বিমান যদিও শপাশপ করে তাকে বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছে, তবু সে ছাড়ছে না।

ফুটবল খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে ছুটে এসে স্বপন কুকুরটার পেটে এক লাথি কষাল দারুণ জোরে। কুকুরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালে। সে বিমানের হাত ধরে বলল, "ছোট্!"

কুকুরটা সঙ্গে-সঙ্গে আবার তাড়া করে এসেছে, পুরো বারান্দাটা ওরা ছুটে পার হবার আগেই কুকুরটা ওদের ধরে ফেলবে! ডান দিকে একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি দেখে ওরা সেটা দিয়েই উঠে পড়ল—কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে বেল্ট পেটা করে আটকাচ্ছে সেটাকে।

ছাদের দরজার কাছে এসে যদি দেখত দরজাটা বন্ধ, তা হলে আর ওদের বাঁচবার কোনো উপায়ই থাকত না। ভাগ্যিস দরজাটা খোলা ছিল। কুকুরটাকে বাইরে রেখে ওরা কোনো রকমে দরজাটা বন্ধ করে দিল ছাদে উঠে। কুকুরটা প্রচণ্ডভাবে ডাকতে লাগল।

৫

ছাদটা বিরাট বড়, ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যায়।

এর ওপরেও একটা গম্বুজ রয়েছে। দুর্গ-টুর্গতে যে-রকম থাকে। ওরা দুজনে সেই গম্বুজের সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল।

বিমানের পায়ে কুকুরের পায়ের দাগ বসে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। আর-একটু হলে বোধহয় মাংস ছিঁড়ে নিত। বিমানের ব্যথা করছে খুব, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

স্বপন বলল, "কুকুরটা এমন অদ্ভুত ব্যবহার করল কেন? প্রথমে আমাদের দেখে শান্ত হয়ে ছিল, তারপর হঠাৎ কীরকম রেগে গেল।"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়! কী হবে তা হলে?"

স্বপন বলল, "ফিরে গিয়ে ইঞ্জেকশান নিয়ে নিলেই হবে।"

"কিন্তু ফিরব কী করে? সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেই তো কুকুরটা আবার কামড়াবে।"

"একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। তখন তোকে বললাম, তাড়াতাড়ি নেমে যেতে!"

"বিছানায় একটা কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখেও চলে যাওয়া যায়?" তোর মাথার ওপরেও তো ওটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তোকে কামড়েছে?"

"না বোধহয়।"

স্বপন মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেখাল। স্বপনের ঘাড়ে কয়েকটা নখের আঁচড়ের দাগ আছে, কিন্তু কুকুরটা ওকে কামড়াতে পারেনি। বিমান এমনিতে খুব সাহসী ছেলে হলেও কুকুরের ব্যাপারে একটু ভয় পায়। এই কুকুরটা পাগলা হলে তো আর রক্ষে নেই। বারোটা ইঞ্জেকশান নিতে হবে বিমানকে। ইঞ্জেকশান নিতে তার একটুও ভাল লাগে না।

এবার ফেরা যাবে কী করে? একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওরা পুরো ছাদটা ঘুরে দেখল। যদি অন্য কোনো দিক দিয়ে নেমে যাবার উপায় থাকে। না, নেই। সে-রকম কোনো পাইপও নেই, যা বেয়ে নেমে যাওয়া যায়। যেতে হবে ঐ দরজা দিয়েই। সেখানে এখনো কুকুরটা ডাকছে।

বিমান বলল, "চল, এই গম্বুজটায় উঠে দেখি একবার।"

গম্বুজটা গোল, প্রায় দেড়তলার সমান উঁচু। ছোট্ট একটা দরজা রয়েছে, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। তা হলেও দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক করা যায়, ভেতরে দেখা যায় ঘোরানো সিঁড়ি।

বিমান বলল, "এ বাড়িতে আর কোনো ঘর তালাবন্ধ নেই, শুধু এখানে একটা তালা ঝুলছে কেন?"

স্বপন বলল, "বোধহয় অনেক আগে থেকেই তালাবন্ধ ছিল, যখন এ বাড়িতে লোকজন থাকত, তখন কোনো বাচ্চা ছেলে যাতে হঠাৎ একা-একা এটাতে না উঠে পড়ে।"

"তালাটা ভাঙব? ছোট তালা, মরচে ধরে গেছে, ভেঙে ফেলা যায় সহজেই।"

"কিন্তু অন্যের বাড়ির তালা ভাঙা কি উচিত?"

"দ্যাখ্ স্বপন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, এ-বাড়িতে কোনো লোক থাকে না।"

"কী করে বোঝা গেল?"

"কুকুরটার ঐ রকম চ্যাঁচামেচি শুনে কেউ-না-কেউ বেরিয়ে আসতই। আর যদি চোর-ডাকাতের আস্তানা হয়ে থাকে, তা হলে তারাও এতক্ষণে ইচ্ছে করলে ধরে ফেলত আমাদের।"

"হয়তো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের লক্ষ করছে। আমার আর-একটা কথা কী মনে হচ্ছে জানিস বিমান? আমরা ছাদে এসে ভুল করেছি খুব। এখন আর আমাদের পালাবার পথ নেই। মনে কর, এখন যদি কেউ ছাদের দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দেয়, তা হলে আমাদের কী উপায় হবে? এইখানেই দিনের পর দিন না খেয়ে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে।"

আমাদের শুধু-শুধু মেরে কারুর লাভ কী? না, তুই এমনি-এমনি ভয় পাচ্ছিস! লোকজন নেই এখানে।"

"চল্ ছাদের দরজাটা একটু দেখে আসি তবু।"

কুকুরটা তখনও দরজার ওপাশে ঘেউ ঘেউ করছে। কত

একগুঁয়ে কুকুর ওটা, কিছুতেই ও জায়গা থেকে সরবে না মনে হয়।

বিমানরা দরজার এ-পাশ থেকে শিকল দিয়ে দিয়েছে। দরজাটার মাঝখানে একটু ফাঁক আছে। সেখানে চোখ রেখে ওরা বুঝল, ওপাশ থেকে দরজাটায় খিল-টিল কিছু দেওয়া হয়নি। লোকজনেরও কোনো চিহ্ন নেই।

কুকুরটা ওদের গায়ের গন্ধ পেয়ে আরও খেপে গিয়ে দড়াম-দড়াম করে দরজার ওপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। ভাগ্যিস কুকুরটার বেশী বড়-সড় চেহারা নয়। তাহলে দরজাটা ভেঙেই পড়ত।

বিমান বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। জন্তু-জানোয়ারদের স্বভাব হচ্ছে, ওদের গা থেকে যদি হঠাৎ রক্ত বেরোয়, অমনি ওরা খুব ভয় পেয়ে যায়। এই কুকুরটার গা থেকে রক্ত বার করা দরকার।"

স্বপন বলল, "কী করে ওর রক্ত বার করবি?"

"সে-ব্যবস্থা আমি করছি। তুই এক কাজ কর। তুই কুকুরটাকে আরও বেশী রাগিয়ে দে।"

স্বপন "হুস, হাস্, এই যা ভাগ্। যাঃ"—এই রকম করতে লাগল, তাতে কুকুরটা আরও রেগে গিয়ে আরও জোরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল দরজায়।

বিমান এক পায়ের জুতো খুলে ফেলল। মোজার নীচ থেকে বেরুলো একটা ব্লেড। পা থেকে মোজাটা খুলে নিয়ে হাতে পরে নিল। তারপর সেই হাতে ব্লেডটা ধরে দরজার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিল ব্লেডটা।

কুকুরটা না-জেনে সেই ব্লেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই দারুণ আর্তনাদ করে উঠল। তার ঠিক নাকে লেগেছে। কুকুরের নাকই সবচেয়ে নরম জায়গা, সেখানে গেঁথে গেছে ব্লেডটা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থায় কুকুরটা আপ্রাণ চাঁচাতে চাঁচাতে পিছন ফিরে হুড়মুড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

বিমান বলল, "দেখলি কাজ হল কিনা!"

স্বপন বলল, "কিন্তু এতে তো কুকুরটা আরও রেগে গেল। এবার ও কামড়াবেই!"

"আর ও ভয়ে এদিকে আসবে না!"

"আমি কিন্তু এক্ষুনি যেতে চাই না। কুকুরটা যদি সিঁড়ির নীচে বসে থাকে—"

"আর একটু অপেক্ষা করে দেখি তা হলে। আমি জানি, ও আর আসবে না।"

তুই ব্লেডটা সঙ্গে করে এনেছিলি?"

"আমি যখন কোথাও যাই, জুতোর মধ্যে একটা ব্লেড রাখি। এটা প্রিয়রতদার কাছ থেকে শিখেছি। খুব কাজে লাগে।"

"সত্যি তো কাজে লেগে গেল আজ দেখছি! আমরা এখানে আরও অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। যদি তার মধ্যে কুকুরটার আর কোনো সাড়া শব্দ না পাই, তখন নামার চেষ্টা করব।"

বিমান আবার জুতো-মোজা পরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, "চল, ততক্ষণে গম্বুজের ওপরটায় উঠে একবার দেখে আসি।"

"তালাটা ভাঙবি তা হলে?"

"ঐটুকু একটা তালা ভাঙলে কী আর এমন হবে?"

গম্বুজের কাছে এসে বিমান তালাটা নেড়েচেড়ে দেখল, টান মারল দুবার। কিন্তু মরচে-ধরা ছোট তালা হলেও সেটা

বেশ শক্ত। ভাঙা যাবে না সহজে।

বিমান বলল, "একটা কোনো লোহার ডান্ডা-ফান্ডা পেলে হত!"

কিন্তু ছাদটায় সেরকম কিছু নেই। এক টুকরো ইঁটও পড়ে নেই কোথাও।

স্বপন একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে তারপর ছুটে এসে লাথি কষাল দরজাটায়। তাতেই কিন্তু কাজ হল। তালাটা ভাঙল না, দরজার একটা কড়া খুলে বেরিয়ে এল।

ভেতরে ঢুকবার আগে বিমান বলল, "সাবধান, দেখিস স্বপন, এর ভেতরে বাদুড় কিংবা চামচিকে থাকতে পারে। এরকম জায়গায় ওদের বাসা থাকে।"

সঙ্গে-সঙ্গে গম্বুজটার ভেতর থেকে কড়্‌ড়র করে একটা শব্দ হল।

চামচিকে বা বাদুড় নয়, তার থেকেও বড় জিনিস। গম্বুজটার ওপর একটা শকুনের বাসা। একটা শকুন লম্বা ঘাড় ঝুঁকিয়ে ওদের দেখছে। বিচ্ছিরি দেখতে শকুনটাকে, ঘাড়ে একটাও লোম নেই। চোখ দুটো লাল লাল।

স্বপন বলল, "কাজ নেই আর ওপরে গিয়ে। অত বড় শকুন যদি ঠুকরে দেয়!"

বিমান বলল, "শকুন কখনো জ্যান্ত মানুষকে ঠোকরায় না। শকুন শুধু মরা জিনিস খায়।"

"না রে, আমি শুনেছি, শকুন বাচ্চা ছেলেদের চোখ ঠুকরে নেয় অনেক সময়।"

"কিন্তু আমরা তো বাচ্চা ছেলে নই। শকুনকে ভয় পাবার কী আছে?"

"যদি আরও অনেক শকুন মিলে তাড়া করে আসে?"

"এত ভয় পাচ্ছিস কেন? শকুন আমাদের কিছু করতে পারবে না। ওরা আসলে ভিতু পাখি। এর থেকে চিল অনেক হিংস্র।"

"শকুনের বাসা তো তালগাছে হয়। মানুষের বাড়িতে বাসা বাঁধবে কেন?"

"জেনে গেছে যে, এ বাড়িতে মানুষ থাকে না। এর থেকেই আরও বোঝা গেল যে এ-বাড়িতে কোনো মানুষজন এমনকী চোর ডাকাতও থাকে না। পশু - পাখিরা এসব জিনিস ঠিক টের পেয়ে যায়।

বেল্ট ঘুরিয়ে হুস-হুস শব্দ করতেই শকুনটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল।

ওরা সাবধানে গোল ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। শকুনের বাসায় কোনো বাচ্চা নেই। বাচ্চা থাকলে অবশ্য একটু অসুবিধে হত, মা-শকুনী এত সহজে উড়ে যেতে রাজি হতো না!

গম্বুজটার ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায় বহু দূরে পর্যন্ত। চোখ একেবারে ভরে যায়। চতুর্দিকে ছোট-ছোট পাহাড় আর জঙ্গল। অনেক দূরে একটা ছোট্ট নদী। রোদ্দুরে তার জল রুপোর মতন চকচক করছে। একটা রেল-স্টেশনও দেখা যায় এখান থেকে। ঐটাই বোধহয় ঝাঁঝা স্টেশন।

বিমান বলল, "বাড়িটা সত্যিই দুর্গের মতন। এই গম্বুজটার ওপর দাঁড়ালে এ-বাড়ির দিকে কখন কোন্ লোক আসছে, তা আগে থেকেই দেখে ফেলা যাবে।"

স্বপন কোনো উত্তর দিল না। সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। শকুনটা মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে। শকুনরা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, এখানে কিন্তু এটা একা-শকুন। স্বপন ভাবছে, ওরা একটু অনামনস্ক হলেই যদি শকুনটা হুস্ করে নীচে এসে ঠুকরে দেয়! এ-বাড়িতে এসে এর মধ্যেই ইঁদুরের কামড় আর কুকুরের কামড় খেতে হয়েছে, এর পর যদি আবার শকুনের কামড় খেতে হয়, তাহলে আর সহ্য করা যাবে না!

স্বপন বলল, "চল, আমরা এবার নেমে পড়ি।"

বিমান বলল, "আর একটু দাঁড়া। আমার খুব ভাল লাগছে দেখতে। ঐ দ্যাখ ঐ মাঠটার মধ্যে কী রকম ধুলো উড়ছে। ওখানে বোধহয় ঘূর্ণী আছে।"

স্বপন বলল, "ঝড়ও উঠতে পারে। তার আগে নেমে পড়া দরকার!"

গম্বুজের ওপরের গোলমতন জায়গাটা কোমর-সমান লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখানটায় খুব হাওয়া, তাই স্বপন রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। হঠাৎ তার মনে হল, রেলিংটা একটু যেন নড়ে উঠল।

সে ভাবল, "কী রে বাবা, এই রেলিংটাও ভেঙে পড়বে নাকি? কিন্তু এটা তো কাঠের নয়, লোহার!

তারপর তার মনে হল, পায়ের তলার জায়গাটাও কাঁপছে। পুরো গম্বুজটাই দুলছে একটু-একটু।

স্বপন বড়-বড় চোখ করে বিমানকে জিজ্ঞেস করল, "তুই টের পেয়েছিস?"

"কী?"

"গম্বুজটা একটু একটু দুলছে।"

"দূর পাগল! ইঁট সিমেন্টের গম্বুজ কখনো দুলতে পারে নাকি?"

"তুই দ্যাখ্, ভাল করে লক্ষ করে দ্যাখ্!"

"কই, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তো!"

বাড়িটার নীচ তলার দিক থেকে দ্‌ম্‌ করে একটা শব্দ হল; যেন কেউ বিরাট একটা পাথর ছ্‌'ড়ে মেরেছে। এ-শব্দটা বিমানও শ্‌নতে পেয়েছে, সে কান খাড়া করে রইল।

স্বপন বিমানের হাত খপ্‌ করে চেপে ধরে বলল, "শিগগির নীচে চল!"

বিমান আর বাধা দেবার সময় পেল না। স্বপন তাকে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে এল গম্ব্‌জটা থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে গম্ব্‌জটার গা থেকে একটা ইঁট খসে পড়ল মাটিতে। স্বপন বলল, "প্‌রনো বাড়ি থেকে এ রকম ইঁট-ফিট তো মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়েই!"

স্বপন চিৎকার করে বলল, "ইডিয়েট, ব্‌ঝতে পারছিস না? ভূমিকম্প হচ্ছে। এক্ষ্‌নি আমাদের ফাঁকা জায়গায় চলে যেতে হবে, না হলে মরব!"

"ভূমিকম্প? যাঃ!"

বিমান ঐ কথা বলা মাত্রই প্‌রো ছাদটা মোষের পিঠের মতন একবার কেঁপে উঠল। বিমানও এবার স্পষ্ট ব্‌ঝতে পেরে বলল, "তাই তো!"

স্বপন বলল, "প্‌রনো বাড়ি, এক্ষ্‌নি ভেঙে পড়বে!"

কুকুর থাক বা না-থাক, আর চিন্তা করার সময় নেই। ওরা দৌড়ে এসে ছাদের দরজার শিকলটা খ্‌লে ফেলল। তারপর দ্‌পদাপ করে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

কুকুরটা বসে আছে দোতলার বারান্দায়। নাক থেকে ব্লেডটা খসে পড়ে গেছে, কিন্তু তখনো রক্ত ঝরছে।

বিমান আর স্বপন দ্‌জনের হাতেই বেল্ট। একদৃষ্টে চেয়ে আছে কুকুরটার দিকে। লাফিয়ে তেড়ে এলেই ওরা বেল্ট চালাবে।

কিন্তু কুকুরটা এবার আর তেড়ে এল না। সেই এক জায়গাতেই বসে থেকে হাঁ করে ম্‌খটা একট্‌ বেঁকিয়ে খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দ করতে লাগল। বোঝাই যায়, কুকুরটা ভয় পেয়েছে এবার।

কুকুরটার পাশ দিয়েই ওদের যেতে হবে একতলার সিঁড়িতে। বেল্ট বাগিয়ে ধরে ওরা পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল। কুকুরটা ওদের দিকে ঘাড় ঘ্‌রিয়ে সেই রকম শব্দ করছে। ওরা এক ছ্‌টে চলে এল সিঁড়ির কাছে। তরতর করে নেমে গেল।

ওরা একতলায় পৌঁছনো মাত্রই এক জায়গার দেয়াল থেকে অনেকখানি ইঁট স্‌রকির চাপড়া ভেঙে পড়ল হ্‌ড়ম্‌ড় করে। খানিকটা দ্‌রে অবশ্য।

বিমান বলল, "কোন ঘরটা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢ্‌কে-ছিলাম?"

পরপর অনেকগ্‌লো ঘরের দরজা খোলা। সব একরকম ঘর। কোন্‌ ঘরের ভাঙা জানলা দিয়ে ওরা ভেতরে এসেছিল, তা ব্‌ঝতে পারছে না। কিন্তু আর দেরি করবার সময় নেই। যে-কোনো সময় মাথার ওপর বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে।

এক-একটা ঘরে ওরা উঁকি মেরেই বেরিয়ে আসতে লাগল। সে-সব ঘরের জানলা বন্ধ। ঘরগ্‌লো অন্ধকার। কিছ্‌ই বোঝা যাচ্ছে না।

স্বপন বলল, "হাওয়ায় বোধহয় সেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। যে-কোনো একটা ঘরের জানলা ঠেলে দেখা যাক।

একটা জানলা খ্‌লতেই দেখা গেল তাতে লোহার শিক আছে। আবার একটা জানলা। এরকমভাবে একটা জানলায় দেখা গেল, একটা শিক ভাঙা। সেই ফাঁক দিয়েই মাথা গলিয়ে ওরা বাইরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রাণপণে ছ্‌টল।

ছ্‌টতে ছ্‌টতে ওরা সেই বাড়ির বাগান পেরিয়ে এসে, পাহাড়ের গা ধরে খানিকটা নেমে এসে তারপর থামল। স্বপন হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল একটা পাথরের ওপর। বিমান জামার হাতায় কপালের ঘাম ম্‌ছল। ব্‌কের ভেতরটা দার্‌ণ ভাবে কাঁপছে। এক্ষ্‌নি একটা-কিছ্‌ হয়ে যেতে পারত। সবচেয়ে বেশী ভয় লাগছিল নীচতলাতে এসেও সেই ভাঙা জানলাটা খ্‌'জে না-পেয়ে।

বিমানও স্বপনের পাশে বসে পড়ে বলল, "এখানকার মাটি তো কাঁপছে না!"

স্বপন বলল, "থেমে গেছে মনে হচ্ছে।"

"বাড়িটা ভেঙে পড়ল না তো!"

"বাড়িটা আমাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়লে ব্‌ঝি তুই খ্‌শী হতি?"

"না, আমরা বেরিয়ে আসবার পরই সব থেমে গেল মনে হচ্ছে!"

"দাঁড়া আর-একট্‌ জিরিয়ে নিই।"

"তোর পাল্লায় পড়ে আর-একট্‌ হলে প্রাণটা যাচ্ছিল! একটা বিচ্ছিরি, ভুতুড়ে বাড়ি!"

"কোথায়, ভূত দেখলাম না তো!"

"ভূত না-থাকলেও ভুতুড়ে। বাড়িটার মধ্যে সব সময় আমার গাটা শিরশির করছিল। সেই বেরিয়ে এসেছি, তারপর থেকে ভালো লাগছে। চল্‌!"

পাহাড়ের যে-দিকটায় সিঁড়ি কাটা, ওরা সেদিকে আসেনি। দৌড়ের ঝোঁকে অন্যদিকে চলে এসেছে। কিন্তু এখান থেকেও পাহাড়ের পেছনের জঙ্গলটা দেখা যায়। ওর মধ্য দিয়ে ওদের ফিরতে হবে।

পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে-নামতে বিমান বলল, "আমার সবচে আশ্চর্য লেগেছে কোন্‌টা জানিস? একটা ঘরের মধ্যে কতকগ্‌লো জ্যান্ত ইঁদ্‌র ঘ্‌রে বেড়াচ্ছে আর একটা সাপ সেখানে মরে পড়ে আছে—এটা খ্‌বই অদ্ভুত না?"

স্বপন বলল, "আর মান্‌ষের বিছানায় একটা কুকুরের শ্‌য়ে থাকাটাই বা কম অদ্ভুত কিসের? তাও পাগলা কুকুর!"

কুকুরটা বিমানের পায়ের যে-জায়গাটা কামড়ে দিয়েছিল, সেখানে রক্ত শ্‌কিয়ে জমে আছে। বেশ ব্যথা। আবার তার ভয় করে উঠল। বারোটা ইঞ্জেকশান!

স্বপন বলল, "কুকুরটা যে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢ্‌কে পড়ে ঘেউঘেউ করছিল প্রথমে, সেই ঘরটা কিন্তু আমাদের দেখা হল না। হয়ত সেখানে কিছ্‌ আছে। চল্‌, আবার ফিরে যাবি নাকি? দেখে আসি, যদি সেখানে গ্‌প্তধন-ট্‌প্তধন পাওয়া যায়!"

বিমান বলল, "আবার? তুই যেতে চাস?"

"কেন? তোর আপত্তি আছে?"

"তুই-ই তো বেশী ভয় পাচ্ছিলি!"

"এবার ভয় কমে গেছে। আবার যেতে পারি আমি!"

এই সময় দ্‌র থেকে সেই কুকুরটার ডাক শোনা গেল। এখন তার ডাকটা খ্‌ব কর্‌ণ মনে হয়।

বিমান বলল, "ওরে বাবা, ঐ পাগলা কুকুরের সামনে আমি আর যেতে পারব না!"

স্বপন হাসতে-হাসতে বলল, "তা হলে দ্যাখ্‌, তুইও ভয় পাস! ফিরে গিয়ে তো সবার কাছে বলবি, আমিই শ্‌ধ্‌ একলা ভয় পেয়েছিল্‌ম!"

"আমার পায়ে বেশ ব্যথা করছে, এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। একট্‌ আস্তে আস্তে হাঁটি, স্বপন!"

"ফিরতে-ফিরতে তো তাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে। যা

খিদে পেয়েছে না! পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে!"

"মনে হচ্ছে কতদিন ভাত খাইনি!"

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে এল। ডান দিকেই সেই জঙ্গলটা। বিকেলের আলো হঠাৎ খুব গাঢ় হয়ে উঠেছে, এর পরেই সন্ধে নামবে। হাওয়া বইছে বেশ জোরে, এক্ষুনি ঝড় উঠতে পারে। ঝড়ের আগেই ওদের জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে হবে।

এক জায়গায় একটা ছোটমতন ডোবা। এক-হাঁটু সমান জল আছে। ওদের দেখেই কয়েকটা ব্যাঙ ডোবার পার থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

স্বপন বলল, "এই বিমান, এই জলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ তো!"

"কী দেখব?"

"জল দেখে তোর ভয় করছে?"

"কেন, ভয় করবে কেন? এইটুকু জল! তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস না? আমি সাঁতারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। আমি জল দেখে ভয় পাব?"

"তাহলে ঐ কুকুরটা পাগলা নয়। পাগলা কুকুরে কামড়ালে এতক্ষণে তোর নিশ্চয়ই জলাতঙ্ক হত!"

"এখনো তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটেনি!"

তবু, বিমান যে জল দেখে ভয় পাচ্ছে না সেটা প্রমাণ করবার জন্য সে ঐ ডোবার মধ্যে নেমে পড়ল। অনেকখানি দৌড়োবার জন্য ওদের সারা গা ঘেমে গিয়েছিল—ঐ জলে ওরা দুজনেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে নিল ভাল করে।

তারপর ওরা জঙ্গলে ঢুকল। এবার জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। কিন্তু উপায় তো নেই, যেতেই হবে একদিকে। এর মধ্যেই জঙ্গলটা আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে।

একটুখানি যাবার পরেই ওরা দেখল, গাছতলায় একটা লোক শুয়ে আছে। সেই লোকটা। পাশে বন্দুক।

লোকটার কথা ওরা ভুলেই গিয়েছিল। দুজনেই চমকে উঠল লোকটাকে দেখে। পা টিপে-টিপে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বিমান টপ করে বন্দুকটা তুলে নিল ওর পাশ থেকে। প্রিয়রতদার সঙ্গে থেকে-থেকে বিমান বন্দুক-পিস্তল নাড়াচাড়া করতে শিখেছে। এটা একটা গাদা বন্দুক, একবারে একটার বেশী গুলি বেরোয় না। এখন বন্দুকটার মধ্যে গুলি

ভরা নেই।

বিমান ফিসফাস করে বলল, "এই লোকটাও কী রকম অদ্ভুত। তখন থেকে এই বন্দুক নিয়ে সেই এক জায়গায় রয়েছে। কোথাও যায়নি। আমার মনে হয় এই লোকটা ঐ বাড়িটাকে পাহারা দেয়!"

স্বপন বলল, "বাড়িটাকে পাহারা দিতে যাবে কীজন্যে? বাড়িটাতে তো কিছুই নেই। তা ছাড়া, আমরা যখন গেলাম, তখন তো ও বাধা দেয়নি।"

"কিন্তু এই লোকটাই বন্দুক ছুঁড়ে প্রথম আমাদের ভয় দেখিয়েছিল! আমার মনে হয়, ও অনেক কিছু জানে!"

বিমান লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই, এই!"

লোকটি চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু খুব একটা অবাক হল না। চেয়েই রইল ওদের দিকে।

বিমান বলল, "এই, তুমি এখানে ঘুমোচ্ছ কেন?"

লোকটা চুপ।

"তুমি কি ঐ হলদে বাড়িটায়, ঐ পিলা কোঠিতে থাকো?"

তবু কোনো উত্তর নেই।

"ঐ বাড়িটাতে কী কী আছে? ওখানে কি পরমাত্মারা থাকে?"

লোকটা তবুও উত্তর দিচ্ছে না দেখে বিমানের খুব রাগ হয়ে গেল। লোকটা তাদের যেন গ্রাহ্যই করছে না।

সে বলল, "স্বপন, তুই লোকটার একটা হাত ধর তো! দেখাচ্ছি মজা!"

লোকটার যদিও লোহার মতন বুক, দারুণ স্বাস্থ্য, তবু কিন্তু সে ওদের কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না। বিমান আর স্বপন দুজনে তার দু হাত ধরে মাটি থেকে টেনে তুলল, তারপর হাত দুটো পেছন দিকে মুচড়ে ধরল।

বিমান বলল, "কথা বলছ না কেন? ইয়ার্কি পেয়েছ?"

লোকটা হঠাৎ মস্ত বড় হাঁ করল। যেন ওদের কামড়ে দেবে।

ওরা দারুণ চমকে গেল লোকটার মুখের ভেতরটা দেখতে পেয়ে। মুখের মধ্যে কোনো জিভ নেই। হয় ওর জিভটা একদম গোড়া থেকে কাটা, অথবা জন্ম থেকেই জিভ ছিল না। এ কথা বলবে কী করে?

ভয় পেয়ে গিয়ে ওরা লোকটাকে ছেড়ে দিল। লোকটার সামনে আর দাঁড়াতেও ওদের গা শিরশির করছে।

বন্দুকটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ওরা ছুটল। ঝড়ও শুরু হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। ওরা ছুটতে ছুটতে, একবারও না থেমে, জঙ্গলটা পার হয়ে গেল। এবার আর রাস্তা চিনতে ভুল হবে না।

হলদে বাড়িটা ওদের কাছে রহস্যময়ই রয়ে গেল। ওরা ওখানে ভূত দেখেনি, কোনো মানুষ দেখেনি, অথচ কী যেন আছে! একটা পুরনো মুখোশ, কিছু ইঁদুর, একটা মরা সাপ আর একটা পাগলা কুকুর। যে-কোনো পুরনো নির্জন বাড়িতেই এসব থাকতে পারে। তবু ওদের মনে হয়েছিল, বাড়িটাই যেন জ্যান্ত, ও বাড়িটাই ওদের বেশীক্ষণ ভেতরে রাখতে চায় না।

আরও একটা কথা। বিমান আর স্বপন পরে অনেককে জিজ্ঞেস করে জেনেছে যে, সেদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় আর কেউ কোথাও ভূমিকম্প টের পায়নি। খবরের কাগজেও কোনো ভূমিকম্পের কথা নেই। ওরাই শুধু ঐ বাড়িটার মধ্যে ভূমিকম্প দেখেছে। সেটাও একটা রহস্য। বাড়িটা ওদের সত্যিই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল?

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার